KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No : KLMLGK 2007	Place of Publication : 34/2 Mohim Haldar St. Cal-26
Collection : KLMLGK	Publisher : Dhira Bhattacharya
Title	Size : 8.5"/5.5"
Vol & Number : 13 15 17 22	Year of Publication : Jan 1998 Sep 1998 May 1999 Jan 2001
	Condition : Brittle Good
Editor : Dhira Bhattacharya	Remarks

CD Rod No : KLMLGK

বইমেলা

অনুরাগ

ত্রয়োদশ সঙ্কলন : মাঘ ১৪০৪ বঙ্গাব্দ

প্রতিষ্ঠাতা ঃ বিশ্বনাথ ঘোষ সর্বাধ্যক্ষ ঃ শান্তি রায়
পৃষ্ঠপোষক ঃ দীপালী চৌধুরী, মীনা বসু, বিউটি মজুমদার, অপরেশ সেন।

অনুরাগ

ত্রয়োদশ সংকলন ঃ মাঘ ১৪০৪ বঙ্গাব্দ
জানুয়ারি ১৯৯৮

উপদেষ্টা ঃ প্রণয়কৃষ্ণ গোস্বামী
সম্পাদক ঃ ধীরা ভট্টাচার্য
সহযোগী ঃ অর্চিতা রায় চৌধুরী, জয়ন্তী সান্যাল, আরতি দাশ
সাংগঠনিক প্রধান ঃ ঋতা বন্দ্যোপাধ্যায়

অনুরাগ প্রকাশন
৩৪/২, মহিম হালদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০২৬

অনুরাগ
ত্রয়োদশ সংকলন ঃ মাঘ ১৪০৪ বঙ্গাব্দ
জানুয়ারি ১৯৯৮ পঞ্চম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
রাগানুগ। পঞ্চম বর্ষ	৩
যা দেখেছি। বিশ্বনাথ ঘোষ	৫
শাসন করা তারি সাজে। ধীরা ভট্টাচার্য	৬
ঠাকুর বাড়িতে জাপানি। অর্চিতা রায়চৌধুরী	৯
হিসাব। মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫
অমিত্রাক্ষর ছন্দ। রবিন দে	২১
পতি দিয়ে নাম। মাণিক শেঠ	২৭
আনন্দ-বেদনা। নীরেন্দ্র গুপ্ত	২৯
তবেই হঠাৎ। ধরিত্রী চক্রবর্তী	২৯
প্রতিকৃতি। রণজিত মিত্র	৩০
মনের দিগন্ত। ওমর আলি	৩১
ভাবনা। রুণা মণ্ডল	৩২
শরৎ আলোর কমলবনে। আরাধনা গুপ্ত	৩২
তখনও। বাজীরাও সেন	৩৩
আহ্বান। সুধা চট্টোপাধ্যায়	৩৪
দুটি কবিতা। তন্দ্রা বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৫
ওই দুটি চোখ। শান্তিময় বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৬
ফ্যালা নামে ছেলেটা। হরিভট্ট	৩৬
স্বাধীনতা পঞ্চাশ। সুব্রত চক্রবর্তী	৪২
নতুন শতাব্দী। অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৬
ঘুষ। শৈলেন চট্টোপাধ্যায়	৪৭
সাধক-কবির জন্মশতবর্ষ পূর্তি। দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	৪৮

সত্যপ্রেস, ১০/এ, প্যারীমোহন সুর লেন, কলিকাতা—৬ থেকে মুদ্রিত।
পাঁচ টাকা।

ছোট পত্রিকার পক্ষে নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করাও বড় সামান্য কথা নয়। আজ 'অনুরাগ' পত্রিকা পঞ্চম বর্ষে পা দিয়েছে। 'অনুরাগ'-এর সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেকেই কিছুটা আনন্দিত।

আমরা বুকে হাত দিয়ে হলফ করে বলতে পারব না যে আমরাই শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচনা করছি ও প্রকাশ করছি। আমরা কেবল মাত্র সাহিত্য চর্চা করছি। অপ-সাহিত্য অপসংস্কৃতির যে হল্লা চলছে চারদিকে, আমরা কদাপি সে পথ মাড়াইনে।

অনুরাগ তার জন্মলগ্ন থেকেই বাংলা সাহিত্যের সেবা করে আসছে অতি আন্তরিকতার সঙ্গে। সে লক্ষ্য রাখছে ভারতব্যাপী কোথাও যেন বাংলা ভাষার অমর্যাদা না হয়। তেমন উপক্রম দেখলেই সে যথাশক্তি প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করার সংকল্প নেয়।

বাঙ্গালীর অন্যতম গর্বের বস্তু তার সাহিত্য। প্রতি পূজায় ছোট-বড় সবাই শারদীয় সংখ্যা প্রকাশ করে। পশ্চিমবঙ্গে ত্রিপুরায়, আসামে, অন্যান্য প্রদেশে সর্বত্রই অসংখ্য পূজাসংখ্যা বেরোয়। বাংলাদেশে এবং জার্মানি-অস্ট্রেলিয়া, বিলেত-আমেরিকাতেও অনেক পত্রিকা প্রকাশিত হয় এই সময়। সব মিলিয়ে বোধ হয় কয়েক হাজার হবে। এই গ্রহের অন্য কোনো ভাষায় কি এমন অসামান্য সাহিত্য মহোৎসবের কথা ভাবা যায়? এও কি ভাবা যায় যে জেলের বাঙ্গালী কয়েদীরা একটি ষান্মাসিক সাহিত্যপত্র প্রকাশ করেছে 'নবার্ক' নাম দিয়ে। আ মরি বাংলা ভাষা!

অনুরাগের নিয়মাবলী

অনুরাগ বছরে তিনটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। বইমেলা, পঁচিশে বৈশাখ, শারদীয়। জানুয়ারি, মে, সেপ্টেম্বরে। প্রতি সংখ্যা পাঁচ টাকা। বার্ষিক সডাক ২০ টাকা।

আপনার ভাল লেখাটি পাঠাবেন। ছোট লেখা পাঠাবেন। আর খেয়াল রাখবেন, ছোট পত্রিকার লেখকরাই পত্রিকার সঙ্গে আর্থিক সহযোগিতা করে থাকেন। অনুরাগের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য।

প্রতি ইং মাসের তৃতীয় শনিবার সন্ধ্যায় সাহিত্য সভা বসে। সম্পাদকের সঙ্গে যা কিছু আলোচনা করা দরকার তখনই করতে হবে। অন্য সময় তাঁকে পাওয়া যাবে না।

'অনুরাগ' বিজ্ঞাপন নেয়। তবে তার লোকবল কম। কেউ বিজ্ঞাপন পাঠালে অবশ্যই ছাপা হবে।

'অনুরাগ'-এর বিজ্ঞাপনের হার

শেষ প্রচ্ছদ	৫০০ টাকা
দ্বিতীয় প্রচ্ছদ	৪৫০ ,,
তৃতীয় প্রচ্ছদ	৪০০ ,,
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৩৫০ ,,
,, অর্ধ ,,	২০০ ,,
,, এক-তৃতীয় ,,	১৫০ ,,
,, এক-চতুর্থ ,,	১২৫ ,,

লিটল ম্যাগাজিন ও স্বউদ্যোগে প্রকাশিত বইয়ের প্রচার ও বিক্রয়ের একমাত্র দায়বদ্ধ অব্যবসায়িক উদ্যোগ—

রা ম ধ নু

মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪২, এস. পি. সি. ব্লক, কাজিপাড়া, বাঘাযতীন, কলকাতা-৭০০০৯২

তিন কপি করে পত্রিকা ও বই পাঠানো যেতে পারে। বিক্রি হয়ে গেলে যথাসময়ে জানিয়ে দেওয়া হয়।

যা দেখেছি বিশ্বনাথ ঘোষ

আমার অভিজ্ঞতাই আমি
(I am what by what I am Experienced)

আমার বন্ধু কলকাতার চিফ্ জাস্টিস্ ছিল সমর দেব। তার ভাই আমাকে বড়ে গোলাম আলি খাঁ সাহেবের গোলাপি পায়ের চেটোয় গাল ঘষে ঘষে লাল করে আমার সঙ্গে পরিচয় করে দিয়েছিল। আমি তাঁর পদধূলি গ্রহণ করেছিলাম। বুঝেছিলাম তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। তবু কাবুল থেকে কলকাতায় আসার অনেক গল্প তিনি আমার সঙ্গে করেছিলেন। বলেছিলেন, দেখছি কলকাতায় অনেক সমজদার মানুষ জন আছেন। তবু এখানে দাঙ্গা হয় বলে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন আর সরল প্রাণে রসিকতা করে বলেছিলেন—পৃথিবীতে সব হিন্দু হলে তা তাঁদের সৎকার করতে গাছ আর একটিও থাকবে না। আর সব মুসলমান হলে তো সৎকার করতে এক বিগোদ জমিও থাকবে না কবর দিতে।

গোয়াবাগানের কার্ত্তিকদা আবদুল করিম খাঁ সাহেবের ভক্ত ছিলেন আর আমাদের বন্ধুও ছিলেন কিন্তু আমার দাদার সহ-পাঠী ছিলেন তা জানতাম না। একদিন ডেলাউসির পথে কার্ত্তিক দা বললেন—সদ্য ম্যাট্রিক পাশ করে স্কটিশ চার্চ কলেজে ঢুকেছি, হঠাৎ একদিন হৈ চৈ পড়ে গেল। আলেজান্দ্রা হোয়াইট্ এসে কম্পিটিশনে প্রবোধ জিতেছে আর কলেজের থ্রু (Through) দিয়ে B. A. M. A. পড়তো যে সব জোঁদা জোঁদা ছাত্র তারা পারে নি। প্রবোধ জিতেছে, বিষয় ছিল প্লেটোস্ রিপ্যাবলিক।

কেমেরুনকে World Bank আর LOAN দেবে না বলছে। মনে পড়ে গেল টাটা নয়, বিরলা নয়, স্যার বীরেনকে Personal Capacity তে LOAN দিয়েছিল World Bankআর তার

পাই পয়সাটিও তিনি শোধ করে দিয়েছিলেন সময়ের আগে। জহরলাল বিধান রায়কে বলেছিলেন, আমি Prime minister of India কিছু জানলাম না আর এটা হয়ে গেল? বিধান রায় বলেছিলেন, তুমি কি বল এটা না হলেই ডাল হত?

ইংরেজের কলকতায় মুরুব্বি ছিলেন রামমোহন, দ্বারকানাথ, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, গান্ধীজি, সুভাষচন্দ্র আর যাঁরা কালাপানি পার হয়েছিলেন তাঁরা হলেন রামবাগান দত্ত বাড়ির ইংরেজি কবিতা লেখিকা তরু দত্ত ইত্যাদি। আরো কিছু যদি জানতে চান তো মানব রায় সৌম্য ঠাকুরই যথেষ্ট। তারপর একটি যুগের সমাপ্তি।

শাসন করা তারি সাজে ধীরা ভট্টাচার্য

শাসন করা তারি সাজে যে ভালবাসতে পারে—এ কথাটা সত্য যে কত বড় সত্য তা কেউ বুঝতেই চায় না। শাসন সকলেই করতে পারে, কিন্তু ভালবাসতে পারে কজন? রাজা প্রজাকে শাসন করে, মনিব কর্মচারীকে শাসন করে, বাবা মা সন্তানদের শাসন করে, শিক্ষক ছাত্রকে শাসন করে, শ্বাশুড়ী বৌকে শাসন করে, শাসন করে না কে? সুযোগ পেলে রক্তচক্ষু দেখাতে সবাই পারে। সকলেই শাসনের রূঢ় দিকটি দেখে মানুষের বিচার করে, কিন্তু একটু গভীর চিন্তা করলেই বোঝা যাবে এর পেছনে কি মানসিকতা কাজ করছে।

যুগ বদলাচ্ছে, এর সঙ্গে মানুষের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গিও পাল্টাচ্ছে। কিন্তু যা শাশ্বত সত্য তা কখনও পাল্টায় না। শতাব্দীর পর শতাব্দী যায়, সমাজের পরিবর্তন হয়, কিন্তু যে সত্য ধর্ম সমাজকে ধরে রেখেছে তা কখনও পাল্টায় না। সামাজিক রীতি নীতি ও নৈতিক রীতিনীতি এক নয়। সামাজিক রীতি-নীতির বদল হয়, কিন্তু নৈতিকতার কোন পরিবর্তন নেই।

বর্তমান যুগ অবক্ষয়ের যুগ। বিজ্ঞানের অনবদ্য আবিষ্কারগুলোর কদর্য ব্যবহার করে মানুষ নৈতিক অধঃপাতকে তরান্বিত করছে। টি,ভি, সিনেমা এবং আনুষঙ্গিক অনেক কিছু রয়েছে, যাদের কু-প্রভাব সমাজের সকল স্তরেই বিস্তার লাভ করছে।

অভিমান বলে একটি শব্দ বাংলা ভাষায় আছে। সেটা এখন সিনেমার নায়ক নায়িকার মত প্রেমিক প্রেমিকা ও স্বামী স্ত্রীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ছোটরা যে অভিমানী হতে পারে তা বড়দের মনে থাকে না। সত্যি কথা বলতে কি ছোটরাও আজকাল অভিমানী হয় না। বাবা মা সন্তানদের শাসন করলে আজকাল তারা অভিমান করে না, রাগ করে বিরক্ত হয়। কিন্তু এই শাসনের পেছনে যে তাদের ভবিষ্যৎ রয়েছে তা কেউ ভাবতেও চায় না। একান্নবর্তী পরিবার আজ ভেঙে যেতে বসলেও, নয় নয় করেও বেশ কিছু পরিবার বাবা মা জ্যেঠা জ্যেঠী, কাকা কাকী বা মাসী পিসি নিয়ে থাকে। ইচ্ছে থাকলেও, কর্তব্যের খাতিরে অনেকেই কারোকে কারোকে ফেলতে পারে না। সংসারে এই বহু আকাঙ্খিত অথচ ভীষণ অবহেলিত মানুষের সংখ্যা কম নয়। আকাঙ্খিত অথচ অবহেলিত কথাদুটী পরস্পর বিরোধী, কিন্তু সত্যিই আজকাল কিছু কিছু মানুষের এমন পরিণতিই হয়েছে। যে দম্পতি একদিন একটি সংসারকে নিজেদের অর্থ ও সামর্থ দিয়ে তিলে তিলে গড়ে তুলেছিল আজ সেখানেই তারা অনাদৃত। বাবা মা ব্যতীত অন্য নিকট আত্মীয় স্বজনের ভালবাসা একটি শিশুমনকে যে কত ভাবে প্রভাবিত করতে পারে তা যে ভালবাসে সেই বোঝে আর যে ভালবাসা পায় সেও বোঝে। একটি শিশুমন যত ভালবাসা পাবে তার কোমল মনোবৃত্তিগুলো ততই ক্রিয়াশীল হয়ে উঠবে। চানক্য পণ্ডিত তার একটি শ্লোকে বলেছেন—

লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি, দশ বর্ষানি তাড়য়েৎ।
প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রে মিত্রবদাচরেৎ॥

এই দুটী ছত্রের মধ্যে যে অমূল্য উপদেশ নিহিত আছে তার মূল্যায়ন আজ কে করছে? আজকাল পঞ্চবর্ষাণির বদলে দশ বর্ষাণি লালয়েৎ হয় আর পঞ্চদশ বর্ষানি হলেই ছেলে মেয়েরা নাগালের

বাইরে চলে যায়। বলা বাহুল্য বাবা মার অন্ধ স্নেহ এই নাগালের বাইরে চলে যাওয়ার পথ পরিষ্কার করে দেয়। এ ক্ষেত্রে বাড়ীর অন্যান্য নিকট আত্মীয়দের শাসন করার কোন অধিকার থাকে না। কেননা সংসারের হাজারো কাজের জন্য তারা আকাঙ্খিত কিন্তু প্রিয়জনকে অধঃপাতে যাবার হাত থেকে রক্ষা করতে একটি শাসন বা প্রতিবাদের বাক্য তাদের বলা চলে না। এ ক্ষেত্রে তারা অবহেলিত। সর্বসাধারণ যেমন মহাজনদের পথ অনুসরণ করে চলবে, তেমনি একটি পরিবারে উত্তর পুরুষরা তাদের পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্যবাহী সুকর্ম ও চিন্তাধারা অনুসরণ করে চলবে। আমার মনে হয়—ভুলও হতে পারে, আজকাল কোন বাবা মা তাদের সন্তান সন্ততিদের তাদের পূর্বপুরুষ সম্বন্ধে অবহিত করান না। যদিও করান তা অতি সীমিত। আমরা কেউই ভুঁইফোড় নয়, আমাদের প্রত্যেকের একটি অতীত আছে, সেখান থেকে আমরা আসছি। অতীতের ভিতের ওপর বর্তমানের জীবনটা দাঁড়িয়ে আছে। তাকে সুসংগঠিত করার জন্য যেমন আহার বিহারের প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন অতীত ঐতিহ্যকে বহন করা, ভালবাসা এবং অবশ্যই সুশাসন। আমরা আমাদের উত্তর পুরুষদের ভালবাসব এবং সেই সঙ্গে নিশ্চয় শাসনের দণ্ডটি হাতে তুলে নেব, কেননা আমরা ভালবাসতে পারি বলেই শাসন করার অধিকারী।

কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য দেখা গেছে ঠাকুমা, ঠাকুর্দা অথবা দাদামশাই দিদিমার অযৌক্তিক ও অতিরিক্ত আদর কিছু কিছু ছেলেমেয়ের স্বভাবকে অসংযত করে তোলে। এক্ষেত্রে তারা বাবা মাকে গ্রাহ্যই করে না। বিশেষ করে যদি তারা বিত্তবান হন। এ-সব ক্ষেত্রে বাবা মাকে শক্ত হওয়া ছাড়া উপায় নেই ; নাতি নাতনি সম্পর্কে আমাদের এ কটি প্রবাদ প্রচলিত আছে "আসলের থেকে সুদ মিষ্টি"। মিষ্টিকে পচনের হাত থেকে রক্ষা করতে যেমন কড়া করে জ্বাল দিতে হয়, তেমনি ক্ষুদে ক্ষুদে সুদগুলোর মিষ্টত্ব বজায় রাখতে মাঝে মাঝে শাসনের দণ্ডটি হাতে তুলে নিতে হয়। তুলাদণ্ডে ভালবাসা আর শাসনের পাল্লা সমান থাকলে সুদ আসল সব ঠিক থাকে।

ঠাকুরবাড়িতে জাপানি অর্চিতা রায় চৌধুরী

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ির পাঁচ নম্বরটিই অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ ও সমরেন্দ্রনাথদের দখলে আর ছয় নম্বর দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনের বাড়িটি ছিল রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর দাদাদের সকলের। পরে অবনীন্দ্রনাথরা অন্য জায়গায় উঠে যান এবং রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে চলে আসেন বীরভূম জেলার বোলপুরের কাছে শান্তিনিকেতন আশ্রমে।

এখানে পড়তে আসেন জাপানি ছাত্র—হোরিসান ১৯০২ সালে। ঐ বছর ভারতে আসেন জাপানের বিখ্যাত চিত্র-শিল্পী ওকাকুরা তেনসিন। তিনি থাকতেন জোড়াসাঁকোয় ঠাকুর বাড়িতে। ওকাকুরা (১৮৬৩-১৯১৩) ছিলেন জাপানের ঐতিহ্যমুখী শিল্প আন্দোলনের প্রধান নেতা। তিনি থেকেছেন রবীন্দ্রনাথের ভাইপো সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতেও। তেনশিন জোড়াসাঁকোয় স্টুডিওতে এসে প্রায়ই অবনীন্দ্র, গগনেন্দ্র ও সমরেন্দ্র ঠাকুরের ছবি আঁকা দেখতেন। ১৯০৩ সালে তিনি স্বদেশ জাপানে ফিরে যান। দ্বিতীয়বার তিনি ভারতে আসেন ১৯১১-১২ সালে। তখনও তিনি ছিলেন সুরেন্দ্রনাথের বাড়িতে। মাত্র একমাস তিনি ছিলেন ওখানে সেবার। ভারত থেকে বস্টন হয়ে তেনসিন দেশে ফেরেন। জাপানে তাঁর মৃত্যু হয় ৯ই সেপ্টেম্বর ১৯১৩ সালে। ১৯০৭ সালে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে আর এক বিখ্যাত জাপানি চিত্র-শিল্পী আসেন। তাঁর নাম ইয়োশিও কাৎসুতী। এক বছর কলকাতায় থেকে বৌদ্ধ শিল্প নিয়ে তিনি বেশ কয়েকটি কাজ করেছিলেন। যেমন—বুদ্ধ ও সুজাতা এবং টেম্পটেশন অব দি বুদ্ধ (১৯২২)। তিনি অজন্তায় যান গুহা-চিত্র দেখতে। অজন্তা-চিত্র-শৈলীতে কাপড়ের ওপর জলরঙে তিনি আঁকেন—এ গ্রুপ অব অপসরাজ (১৯২১) রেশমের কাপড়ের ওপর ভারতীয় পোশাকে সজ্জিতা সামনে দুটি, পিছনে ছয়টি মেয়ে মিলিয়ে মোট আটটি মেয়ে।

তাদের মুখশ্রীতে জাপানের ছাপ সুস্পষ্ট। ওঁর আঁকা সব ছবির অনুলিপি সহ সমালোচনা ছাপা হয় "রূপম" পত্রিকায়। জাপান সরকার পরে ঐসব ছবি জাপানে ফিরিয়ে নেন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ওকাকুরার পরিচয় হয় জোড়াসাঁকোয়। পর পর এলেন কলকাতায় হিজিজা ওনসো, ইয়োকোইয়াজা তাইকান এবং শিমোমুরা কানজাম। তাইকানের সম্পর্কে এসে অবনীন্দ্রনাথের ছবির স্টাইল কিছুটা বদলে গেল। তিনি আঁকলেন বঙ্গমাতা ছবিটি। প্রাচীন ওয়াস পদ্ধতিতে বিশেষ ভাবে ছবি আঁকতেন তাইকান। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর কাছেই শিখলেন তা। রবীন্দ্রনাথের ভাল লেগেছিল তাইকানের আর শিমোমুরা কানজানের আঁকা ছবি। জাপানে ইয়োকোহামায় হারাতোমি তারোর বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হয় শিল্পী কানজানের। কবি তাঁর জন্য উপনিষদের মন্ত্র তমসোমা জ্যোতির্গময় ইংরেজীতে অনুবাদ করে দিয়েছিলেন। কানজাম এঁকেছিলেন এক বিখ্যাত ছবি—ইয়োরো বউস—দুর্বল তাপস—অন্ধের সূর্য প্রণাম। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে ছবির জন্য বিষয়ের খোঁজ করতে তানজানের প্রতি খুশি হয়েছিলেন। তিনি নিজেকে সম্মানিত বোধ করেছিলেন তখন। রবীন্দ্রনাথ কামজানকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের অন্যতম আখ্যা দিয়েছেন। শিক্ষক আরাই কামপোকে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাইকান ও কানজানের আঁকা ছ'খানি ছবি কপি করিয়েছিলেন। এখনও ঐগুলি শান্তিনিকেতনের কলাভবনে রাখা আছে সযত্নে। ১৯২০ সালে শান্তিনিকেতনে কলা-ভবনের প্রতিষ্ঠা হয়।

১৯০৩ সাল থেকেই জাপানি শিল্পী হিলিজা ওনসো এবং ইয়োকোইয়ামা অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে ছবি এঁকেছেন। ওকাকুরাই দেশ থেকে কয়েক জন শিল্পীকে পাঠিয়েছিলেন জোড়াসাঁকোয়। এঁদের সঙ্গে ছিলেন হিলিজা ওনসো ও ইয়োকোইয়ামা তাইকান। এঁদের উদ্দেশ্য ছিল ছবি আঁকা শেখা ও

শেখানো। তাইকান অবনীন্দ্রনাথের কাছে ভারতীয় ও মোগল চিত্রকলার রীতি শিখতেন এবং তাঁকে সেখাতেন জাপানি চিত্রকলার পদ্ধতি। তাইকানের শেখান পদ্ধতি ওয়াশেই অবনীন্দ্রনাথ এঁকেছিলেন তাঁর বিখ্যাত ছবি—বঙ্গমাতা। শিল্পী গগনেন্দ্রনাথও জাপানি দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষা নিয়ে সাদাকালোয় অতি আশ্চর্য সব কাজ করেছেন। বিলিতি জলরঙের কাজে তিনি জাপানি তুলির চাল বজায় রেখেছেন। রবীন্দ্রনাথের "জীবন স্মৃতি" বইয়ের ইলাসট্রেশনে তাঁর নিপুণতার পরিচয় পাওয়া যায়।

জাপানি শৈলী অনুসরণের প্রবণতা বেড়েছে আরো পরে। জোড়াসাঁকোর শিল্পীরা জাপানি শিল্পীদের হাতের কাজ দেখেছেন, শিখেছেন এবং আত্মস্থ করেছেন। ওঁরাও শিখেছেন ভারতীয় শৈলী। ইয়োকোইয়ামা তাইকান এঁকেছেন মেঘের মধ্যে দাঁড়ানো কালী। খাঁড়া হাতে গলায় মুণ্ডমালা। হিলিজা ওননো এঁকেছেন-পদ্মাসনা সরস্বতী। জাপানি আদলের মুখ। সাজ-সজ্জায় ভারতীয় এক দেবী-মূর্তি। তাইকান এঁকেছেন অন্য সব ছবি—দ্বীপ জ্বালানো, রাসলীলা। প্রথম ছবিতে তিনটি মেয়ে নদীর ঘাটে এসেছে তর্পণের অনুষ্ঠানে। রাসলীলা কৃষ্ণ-গোপিনীদের রাসনৃত্যের ছবি। ঐ সব ছবিতে তিনি জাপানি মেয়েদের শাড়ি পরিয়েছেন। ওকাকুরা বয়সে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে দু'বছরের ছোট ছিলেন (১৮৬৩-১৯১৩) আটত্রিশ বছর বয়সে তিনি কলকাতায় আসেন এবং ঠাকুরবাড়ির চিত্র শিল্পীদের কাজের সঙ্গে পরিচিত হন। প্রমথনাথ চৌধুরীর ভাগ্নী কবি প্রিয়ম্বদা দেবীও ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয় সে সময়। তাঁদের মধ্যে পত্র-বিনিময় হত। ভারতে বসে তিনি একটা বইও লিখেছিলেন—আইডিয়াল অব দি ইস্ট। ১৯০৩ সালে বইটি প্রকাশিত হয়। ঐ বইয়ে ভূমিকা লিখেছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। ১৯০৩ সালে জাপানে গিয়ে ১৯১১ সালে আবার ভারতে আসেন।

সেবার প্রায় এগার মাস তিনি ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতে। দীর্ঘদিন তিনি ইউরোপ ও আমেরিকায় শিল্পকলার পাঠ নেন।

সামুরাই বংশে ওকাকুরার জন্ম। ভারতে এসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হন তিনি। দেশে ফিরে তিনি শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের অকুণ্ঠ প্রশংসা করে কবিকে একটি চিঠিও লেখেন। শান্তিনিকেতন দেখেছেন তিনি। তিনিই পাঠিয়েছিলেন ইয়োসি-নবি-হোরি অর্থাৎ হোরি-মানকে শান্তিনিকেতনে সংস্কৃত শেখার জন্য। হোরিসামও ছিলেন সামুরাই বংশীয় অভিজাত। তিনি অত্যন্ত বিনয়ী নম্র ছিলেন। ভারতের নোবেল-জয়ী কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে ওকাকুরার শেষ সাক্ষাতকার হয় সুদূর আমেরিকার বোস্টন শহরে ১৯১৩ সালের ফেব্রুয়ারীতে। তিনি তখন আশা প্রকাশ করেছিলেন শান্তিনিকেতনে একদিন জাতীয় মহাবিদ্যালয়ে পরিণত হবে।

জাপানে পৌঁছে কবি তাইকানের সঙ্গে পরামর্শ করেই শিল্পী আরাই কামপোকে বছর দু'একের জন্য কলকাতায় নিয়ে আসেন। আরাই এক'শ টাকা মাস মায়নায় নিয়োগ-পত্র নিয়ে আসেন বরীন্দ্র-নাথের কাছ থেকে। জাপান যাবার আগেই রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় "বিচিত্রা" প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ওখানে আঁকা শেখাবার দায়িত্বে ছিলেন নন্দলাল বসু। আরাই জাপান থেকে এসে যোগ দিলেন নন্দলালের সঙ্গে। বিচিত্রার কর্মী হিসেবে নন্দলাল ও আরাই-এর মধ্যে ঘনিষ্ঠতা হয়। তাঁরা দ'জনে মিলে ঘুরে আসেন পুরী, কোনারক। সেখানেও তাঁদের শিল্পের অনুশীলন চলে। শিল্পী হিসেবে খুব বড় না হলেও শিক্ষক হিসেবে আরাই ছিলেন খুবই নির্ভরযোগ্য। নন্দলাল তাঁর কাছে শিখেছিলেন হাতে-কলমে নানা রকম জাপানি তুলির ব্যবহার। আরাই অত্যন্ত যত্ন করে বিচিত্রায় কাজ শেখাতেন। এক অসুবিধা ছিল আরাই জাপানি

ছাড়া অন্য কোন ভাষা জানতেন না। কবি তাঁর জন্মদিনে ২৫শে বৈশাখ ১৩২৫ সালে অর্থাৎ মে ১৯১৮ সালে বিদায় জানান আরাই কামপোকে তাঁরই তুলিতে কবিতায়—বন্ধু, একদিন অতিথির প্রায় এসেছিলে ঘরে। আজ তুমি যাবার বেলায় এসেছ অন্তরে। (শ্রীযুক্ত আরাই কামপো প্রিয়বরেষু)। বিচিত্রা তারপর উঠে যায় এবং আরাই কামপো দেশে ফিরে যান ১৯১৮ সালেই। তাই-কানের জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাজ সেই রুতেন নামের এক দীর্ঘপট ৩৮—৬৪ মিটার লম্বা যা তিনি এঁকেছিলেন ১৯২৩ সালে। জাপানি ক্যালিগ্রাফির—অর্থাৎ কালি ও তুলির কাজ আরাই শেখাতেন বিচিত্রায়। নন্দলাল বসুও তাঁর কাছে ঐ কাজটি শিখে নেন। পুত্র রবীন্দ্রনাথকে ব্যায়াম শেখাবার জন্য জাপান থেকে রবীন্দ্রনাথ নিয়ে আসেন সানোসানকে। তারপর ১৯২৯ সালে কানাডা থেকে ফেরার পথে জাপানে গিয়ে জুজুৎসু শিক্ষক জুডোর কোলনী তকাগাকি সানকে শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীদের জুজুৎসু শেখাবার জন্য আনবার ব্যবস্থা করে আসেন।

এর কিছুকাল পরেই তকাগাকি শান্তিনিকেতনে আসেন। তিনি ছিলেন জাপানের বিখ্যাত এক জুজুৎসু বীর। দু'বছরের চুক্তির মেয়াদে তিনি শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। সে সময়ে তাঁর ভাতা-মায়না ইত্যাদি মিলিয়ে বেশ মোটা টাকা বিশ্বভারতীকে বইতে হয়। ক্রমশ বিশ্বভারতীর আর্থিক সংকট চলছিল। এই বিষয়ে কিছু সাহায্য হবে ভেবে কবি তখন কলকাতায় জুজুৎসু ক্রীড়া প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলেন এবং শিক্ষার্থী চেয়ে কাগজে বিজ্ঞাপনও দিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে কোন ফল না হওয়ায় তিনি সুভাষচন্দ্র বসু ও ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়কে চিঠি লিখে অনুরোধ জানান কলকাতা কর্পোরেশনের অধীনে তকাগাকিকে নিযুক্ত করে কলকাতার ছেলে মেয়েদের জুজুৎসু শেখাবার ব্যবস্থা করে দেবার জন্য। কিন্তু সে সময়ে কংগ্রেসের কাজে ব্যস্ত থাকায় তাঁরা কবিকে

কোন আশা দিতে না পারায় ব্যথিত-হৃদয়ে কবি অবশেষে তকাগাকিকে বিদায় দেন। তিনি স্বদেশ জাপানেই ফিরে যান। জাপানি পরিব্রাজক কাওয়াগুচিও ছিলেন কছুদিন ঠাকুর বাড়িতে।

জাপানে রবীন্দ্র-ভক্তদের অন্যতম ছিলেন যোনে নোগুচি। তাঁর শিক্ষালাভ আমেরিকায় এবং সাহিত্য-চর্চার গুরুও সেখানেই। জাপানী ও ইংরেজী ভাষায় অনেক কবিতা লিখেছেন তিনি। সিন অ্যান্ড আনসিন তাঁর লেখা ইংরেজী কবিতার বই। রবীন্দ্রনাথকে নিয়েও কবিতা লিখেছিলেন শান্তিনিকেতনে। ২৯শে নভেম্বর বোলপুর স্টেশনে তাঁকে স্বাগত অভ্যর্থনা জানান কবিপুত্র ও কর্ম সচিব রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পরদিন ৩০শে নভেম্বর শান্তি-দিকেতন আশ্রম-প্রাঙ্গনে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে বিশ্বকবি রবীন্দ্র-নাথ ঠাকুর তাঁকে সাদর সংবর্ধনা জানান। তিনি নিজেই পাঠ করেন স্বাগত ভাষণটি ঐ সভায়। আশ্রমবাসীরা বেদমন্ত্রে এবং কবির লেখা "জনগণমন" গানটি গেয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। উত্তরে নোগুচি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। দেশে ফিরে যাবার পর তাঁর সঙ্গে কবির মতান্তর হয় চিঠি-পত্রের মাধ্যমে। বিশ্ব-ভারতীতে দ্বিতীয় জাপানি ছাত্র ছিলেন-সুশোবিয়োজো। ১৯৩৪ সালে তিনি এসেছিলেন কবির শান্তিনিকেতনে। দেশে ফিরে তিনি নিপ্পনভবন গড়ে তোলায় উদ্যোগী হন রবীন্দ্র নাথের স্মৃতিতে। জাপানে শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে তিনি এক সংগঠন গড়ে তোলেন। ১৯৯৩ সালে তাঁর মৃত্যুর পর সফল হয়েছে তাঁর স্বপ্ন—শান্তিনিকেতনে গড়ে উঠেছে নিপ্পনভবন ১৯৯৪ সালে।

বিশিষ্ট রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক কাজুও আজুমা ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ওখানে জাপানী ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। তিনি পেয়েছেন ডি. লিট ও রবীন্দ্রতত্ত্বাচার্য উপাধি।

তাঁরই চেষ্টায় সাতাশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে শান্তিনিকেতনে গড়ে উঠেছে নিপ্পন-ভবন। তিনি ছিলেন তার সাধারণ সম্পাদক। অবসর নেবার পর তিনি জাপানে ফিরে গেছেন। তবে প্রায় প্রতি বছর তিনি আসেন শান্তিনিকেতনে। এখনও তিনি জীবিত। তাঁর জন্ম ১৯৩২ সালে জাপানে। তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী কাইকো আজুমা লিখেছেন একটি বই—জাপানী ভাষায় —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—জীবন ও সাহিত্য। জাপানে রবীন্দ্রনাথের বইগুলির অনুবাদের কাজে ব্যস্ত রয়েছেন খ্যাতনামা সাহিত্যিক, কবি এবং গবেষকদল। এঁরা সকলেই রবীন্দ্র অনুরাগী ও শ্রদ্ধাবান সরল মানুষ।

হিসাব শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়

যে মেয়েটি মাঝে-মাঝে বিস্কুট দিয়ে যায়, দরজা খুলতেই সেই মেয়েটি। যমুনা। আমাকে ঠিক আশা করেনি যমুনা ঃ 'ওমা মেসোমশায়! অফিস যাননি?

'না।'

ছুটী নিয়েছেন? ভিতরে ঢুকে মেঝেয় বসল ঃ 'এ সময় আপনি থাকেন না তো—তাই জিজ্ঞাসা করছি।'

'আমি রিটায়ার করেছি।'

'তাই না-কি? ভাল-ভাল।'

বড় সাইজের ব্যাগের ভিতর থেকে এক প্যাকেট বিস্কুট তুলে আমার কাছে রাখল। তারপর ঃ

'তাহলে তো এখন পেনসন পাবেন। খাবেন-দাবেন আর ঘুম। না মেসোমশায়?

'হুঁ।'

আচ্ছা মেসোমশায়—দাঁড়ান বলছি। আগে মাসীমাকে ডাকি

—বলে, হাঁক পাড়ল বারকতক 'মাসীমা—মাসীমা' করে। কোন সাড়া না পেয়ে বলল, 'মাসীমা দারুণ রেগে গেছেন। সেই কাল সকাল বলে আজ সাত-আট মাস বাদেই আসছি। কি করব বলুন। এমন জ্বরে ধরল যে—থেমে গিয়ে বড়-বড় চোখে আমার দিকে তাকাল ঃ 'মেসোমশায়, যা বলছিলুম। গভর্নমেণ্টের চাকরীর নাকি নিয়ম, স্বামী মারা গেলে বিধবা স্ত্রী পেনসনের অধিকার পাবে।

'হ্যাঁ।'

'হায়রে!' ভিতর থেকে যমুনার একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল ঃ 'আমার কি কপাল' তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে গা-ঝাড়া দিয়ে খুব বড়গলায় ডাক দিল ঃ 'মাসীমা, আপনার যমুনা এসেছে। আসুন। আপনার জন্য দারুণ একরকম বিস্কুট এনেছি। আমার ভীষণ অসুখ করেছিল। তাই আসতে পারিনি।

কোন উত্তর নেই—

'মাসীমা বাড়ীতে নেই নাকি, মেসোমশায়? উনি তো কোথাও বড় যান না। বলেন, হাঁপ লাগে।' যমুনা আমার দিকে মুখ ঘোরায় ঃ 'মাসীমা কোথায় গেছেন?'

ওকে উৎকণ্ঠায় না রেখে বলে ফেললুম ঃ 'শানো।' তোমার মাসীমা নেই। মারা গেছেন।,

'কি বলছেন? আঁতকে উঠল যমুনা। ঘর কাঁপিয়ে হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল, 'আপনি কি বলছেন, মেসোমশায়। কবে এমন সর্বনাশ হল। ও মা! এ কি কাণ্ড—! নিজের শরীর-টাকে হেঁচড়ে-হেঁচড়ে টেনে এনে ও আমার কাছে এগিয়ে এল। তারপর পা দুটোকে আঁকড়ে ধরে অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে অবিশ্বাসের জিজ্ঞাসা করল ঃ 'আপনি যা বলছেন, তা কি সত্যি? না, আমাকে ক্ষেপাচ্ছেন। রগড় করছেন? ও মেসোমশায়—আমি যে মাসীমাকে ভালমানুষ দেখে গেলুম। এর মধ্যে এমন কি

যল—?' দু'হাতে আমার ডানহাতটা খামচে ধরল।

বললুম ঃ 'জানিনা' বলতে পারব না। রাতে শুয়ে আছি। তোমার মাসীমা বলল, বুক ব্যথা করছে। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। ডাক্তার ডাকার আগেই শেষ।'

হাত দুটো যমুনার আলগা হয়ে গেল। বেশ কিছুক্ষণ দম ধরে থেকে ফিক্ করে বেঢপ রকম হেসে উঠল—'জানেন, মাসীমা মাঝে-মাঝে কি বলতেন? বলতেন, তোমাকে দেখি, আমার একটা কথা মনে হয়, যমুনা। তোমার মেসোমশায় সরকারী চাকরী করেন। পেনসন পাবেন। আমি সিঁদুর নিয়ে যেতে চাই। তবু যদি কপালদোষে তোমার মেসোমশায়ের কিছু হয়ে যায়, তো আমি বিধবা-পেনসন পাব। এটাই আমার মস্ত ভরসা। নইলে, আমার যা শরীর—এ শরীর নিয়ে তো তোমার মতন দরজায়-দরজায় বিস্কুট বেচতে পারতুম না। হয়তো রাস্তায় পড়ে মরে থাকতে হত।

একটা বড় রকমের হাঁপ ছাড়ল যমুনা। জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটল ঃ মেসোমশায়, গলাটা শুকিয়ে যাচ্ছে—একটু জল খেতুম—'

আমাকে উঠতে দেখে—

'না—না করে উঠল যমুনা। বলল, 'আপনার আপত্তি না থাকে তো আমি জল ভরে খাচ্ছি।'

'খাও।'

ঘরের হতশ্রী চেহারা দেখে বলল, 'আপনার খাওয়া-দাওয়ার কি হচ্ছে?

'হাত পুড়িয়ে খাচ্ছি।'

কতদিন পারবেন? এই বয়সে—?'

'দেখা যাক।'

'দেখা যাক না।' আমার কাছে এসে দাঁড়াল যমুনা ঃ সর্ব-

ক্ষণের জন্য একটা লোক রাখুন।'

'তুমি তো বললে, রাখুন। সর্বক্ষণের জন্য লোক পাওয়া মুস্কিল।'

'কিছু মুস্কিল না। আমাকে রাখুন।'

'তোমাকে?' আমি হেসে উঠলুম ঃ 'কি আজে-বাজে কথা বলছ?'

'আজে-বাজে কেন?' ওর কথার ভঙ্গীতে তর্কের ঝড় আভাষ পেল।

ওকে শান্ত করার জন্য বললুম ঃ 'আমি যতদূর শুনেছি, তোমার মাথার উপর দাদা আছেন। বাচ্চা বয়সে বাবা-মা মারা গেলে তোমার দাদা স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে তোমাকে বড় করেছেন, তোমার বিয়ে দিয়েছেন—

আমাকে বাধা দিয়ে বলে উঠল যমুনা—এমন বিয়ে দিল যে, একমাসের মধ্যে বিধবা হলুম।'

'সে তোমার দাদা কি করবেন। কারখানা থেকে বাড়ী ফিরবার পথে গাড়ী চাপা পড়ল তোমার স্বামী—তাইতো—?'

'হ্যাঁ। ঠিকই বলেছেন। আমার কপাল খারাপ। নইলে এমন কাণ্ড হবে কেন?' চোখের জল মুছল যমুনা। তারপর কতকটা আপনমনে ও বিড়বিড় করে বলছে শুনলুম ঃ

মাসীমা বলতেন, যমুনা, তোমাকে আমার একদিক দিয়ে হিংসে হয়। আমার ভাইরা আমার খোঁজ-ও নেয়না। আর তোমার দাদা? তোমার শ্বশুরবাড়ী বলে কিছু নেই বলে তোমাকে নিজের কাছে এনে রেখেছে—।'

'তবে?' আমি ওকে ভর্ৎসনার সুরে বললুম ঃ 'তুমি সেই ভাইয়ের সংসার থেকে চলে আসবে! এ কেমন কথা। ছিঃ!'

'কিন্তু মেসোমশায়, আমায় নিজেকে কেমন যেন দাদার গলগ্রহ বলে মনে হয়। মনে হয়, আমি দাদার সংসারে বোঝা। বৌদি

যখন খেতে ডাকে, গলা দিয়ে ভাত নামতে চায় না—আটকে থাকে। তাই যা পারি, দাদার সংসারে দেওয়ার জন্য বিস্কুট বেচি।'

যমুনার দু'চোখ বেয়ে জল।

বলল ঃ 'দরকার না থাকলেও মাসীমা আমাকে বলতেন, আমার বিস্কুট কই যমুনা? বলে, ঘরের চারদিকে তাকাতে লাগল। তারপর পরম আগ্রহভরে আমাকে জিজ্ঞাসা করল ঃ আচ্ছা মেসোমশায়, দাদার যদি আপত্তি না থাকে তো আপনি আমাকে রাখতে পারবেন না?

পরিষ্কার হলুম ঃ 'দেখো, আমি একা। এ অবস্থায় তোমার মতন অল্পবয়সী মেয়েকে রাখাটা এবং তোমার দিক দিয়ে থাকাটা কি ঠিক হবে?'

'কেন?' যুক্তি দেখাল ও ঃ 'আমি তো আপনার মেয়ের মতন।' বলেই জিভ কাটল, 'কিছু মনে করবেন না মেসোমশায় আপনার ছেলেমেয়ে নেই আমার মনে ছিল না।'

বললুম—'ওতে কোনকিছু মনে করার নেই। মনে করার কথা কোন্‌টা জান? তুমি বলছ, তুমি আমার মেয়ের মতন। কিন্তু লোকে বলবে, আমি মেয়েমানুষ রেখেছি।

'ছিঃ, ছিঃ', শুনেই লাফ দিয়ে উঠল যমুনা', এ কি কথা বললেন? ছিঃ।' বলেই, ঘর ছেড়ে চলে গেল।

টেবিলের উপর রাখা ওর বিস্কুটের প্যাকেটটার দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে ভাবতে লাগলুম, এতটা স্পষ্টবাদী হওয়াটা আমার উচিত হয়নি। মেয়েটা আমাকে বড্ড ছোট, ইতর মনে করে গেল। আর এ-মুখো হবেনা।

কিন্তু, পরদিনই এসে হাজির।

'মেসোমশাই, দাদার আপত্তি নেই।'

'কোন্ ব্যাপারে?'

'আপনার এখানে যদি থাকি।'

'কিন্তু আমার আছে যমুনা। এবং কেন, সেটাও তোমাকে খুব খোলাখুলি করে বলছি।'

গাঢ় গলায় যমুনা জানাল: 'আদি সেদিকটাও ভেবেছি। আমি, আপনি স্বামী-স্ত্রী হিসাবে তো থাকতে পারি।'

কথাটার তাৎপর্য বুঝলুম না। জিজ্ঞাসা করলুম: 'তুমি কি বলতে চাইছ, স্পষ্ট করে বলতো?'

'বলছি, আপনি আমাকে বিয়ে করতে পারেন। আর কোন সমস্যা থাকবেনা।'

শুনে এমন হাসি পেল যে, প্রথমটা চাপতে গেলুম। কিন্তু হাসির গমকটা গলার কাছে এসে এমন ধাক্কা দিল যে, চাপতে গেলে বিষম খেয়ে মরে যাব। তাই শত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি ঘর কাঁপিয়ে হ্যা-হ্যা-হ্যা করে হেসে উঠলুম। সে-হাসি আমার নিজের কাছে খুবই শ্রুতিকটু মনে হল। তবু হাসি থামাতে পারলুম না। হাসির দাপটে চোখ বেয়ে জল এসে মুখখানাকে কদাকার করে তুলল।

'জল খাবেন?' যমুনা বলল।

'দাও।'

জল খেয়ে নিজেকে একটু সামলে নিয়েছি দেখে, যমুনা বলল, 'আপনি এমন—কিছু মনে করবেন না মেসোমশায়—এমন উৎকট রকম হেসে উঠলেন কেন?'

'তুমি উৎকট প্রস্তাব করলে। হাসবনা? কাপড় দিয়ে নিজের মুখ মুছতে-মুছতে বললুম: 'আমার এক-পা শ্মশানে—আর এক বাড়ানোর মুখে। তুমি কোন্ হিসেবে আমাকে বিয়ে করতে চাও? তার মানে আর একবার বিধবা হতে চাও?'

'হ্যাঁ, চাই।' যমুনার দু-চোখ ঝলসে উঠল: 'এবার বিধবা হলে আপনার স্ত্রীর দাবীতে পেনসন পাব। বিস্কুট বেচতে হবেনা।

অমিত্রাক্ষর ছন্দ রবিন দে

সওদাগরী অফিসের কেরানী, বংশীবদন পাক্কা দেড়বছর প্রেমে হাবুডুবু খাবার পর যখন 'শ্রীশ্রী প্রজাপতয়ে নমঃ' লেখা চিঠি এনে সামনে ধরলে তখন মুখে হাসি আর ধরে না।

এতে নতুন কিছু নেই। কিন্তু তারপরেই যেটা করলে, সেটা নতুন।

বিয়ের মাত্র তিন বছরের মধ্যে বংশীবদন সবাইকার সঙ্গে কথা বলাই বন্ধ করে দিলে। অমন হাসি খুশি আমুদে ছেলে কেমন যেন দিন দিন চুপসে যেতে লাগলো। ক্রমে কঙ্কালসার দেহ, চোখ কোটরাগত। বংশীবদন ধুঁকতে ধুঁকতে অফিসে আসে সারাদিন নিজের টেবিলে মুখ নিচু করে বসে থাকে।

অফিস সুদ্ধ সবাই অবাক! কি ব্যাপার?

সকলে নানা প্রশ্ন করে, কিন্তু বংশীবদন কোন উত্তর দেয় না। শেষে একদিন সবাই ছেঁকে ধরলে—বলতেই হবে, কি এর কারণ? নিশ্চয় কোন সাংঘাতিক অসুখ বিসুখ করেছে?

—না।

—তবে কি উদ্দাম প্রেমে হঠাৎ ভাটা পড়েছে?

—মোটেই না।

—তবে কি মিসেস্ সন্তান সম্ভবা?

—না।

—তবে কি পুজোর চাঁদার জন্যে পাড়ার ছেলেরা ভয় দেখিয়েছে?

তাও না।

—তবে কি মিসেসের অন্য কোন প্রণয়ীর সন্ধান পাওয়া গেছে?

বংশীবদন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে—এ সবের কোনটাই নয়।

পৃথিবীতে এর থেকেও মারাত্মক, আরো ভয়াবহ ব্যাপার আছে।

সবাইকার চক্ষু কপালে উঠলো। কি এমন রহস্যপূর্ণ ব্যাপার ?

কিন্তু বংশীবদন আর কোনো কথাই বললে না। ঘাড় গুঁজে বসে রইলো।

কোনো উপায় না পেয়ে সবাই মিলে, সহকর্মী গঙ্গাধর আর ভোম্বলদাকে চুপি চুপি বংশীবদনের বাড়ি পাঠান ঠিক করলে।

কিন্তু খোঁজ খবর নিয়ে ফিরে আসার পর গঙ্গাধর আর ভোম্বলদাও হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। একটি কথাও ফাঁস করা গেল না।

সবার কৌতূহল আরো বেড়ে গেল।

অগত্যা আবার তিন জন অতি অভিজ্ঞ সহকর্মীকে পাঠান হল ঃ ঘনশ্যাম দা, যদুপতি দা আর হেরম্ব বাবু।

কিন্তু দেখা গেল ফিরে এসে তারাও গম্ভীর। তাজ্জব ব্যাপার! রহস্য আরো জটিল হয়ে উঠলো। শেষে মরিয়া হয়ে, অফিস সুদ্ধ সবাই একদিন বংশীবদনের বাড়ি এসে হাজির।

কিন্তু গিয়ে যা দেখলাম তাতে সবাইকারই চক্ষু স্থির। কারো মুখ থেকেই আর কথা বেরল না।

মাত্র তিন বছর আগে বিয়ের রাত্রে দেখা লাজনম্র, তন্বী শ্যামা শিখরী দশনা বধূ যে মাত্র তিন বছরের মধ্যে এক বিশাল বপু বিরাট আকার ধারণ করবে, এটা কি কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিল ?

সরাসরি তার দিকে চাইতেই কারো সাহস হল না। আড়চোখে চেয়েই স্পষ্ট বোঝা গেল যে তার দেহের ওজন কমসে কম আড়াই মণের এক ছটাক কম নয়। এদিকে বেচারা বংশীবদনের শরীরের মেদ মজ্জা, আয়তন ঠিক সেই অনুপাতে কমেছে।

স্বাস্থ্যই সম্পদ। কিন্তু যাকে ঐ রকম বিশাল বপু

অর্দ্ধাঙ্গিনীকে নিয়ে দাম্পত্যজীবন যাপন করার মহড়া দিতে হয়, কেবলমাত্র সেই জানে, সব সম্পদ সুখের কারণ হয় না।

অফিস সুদ্ধ সবাই এইটুকুই বুঝলো ; ছলে-বলে-কৌশলে যে কোন উপায়ে বংশীবদনের বৌকে রোগা না করতে পারলে সমূহ বিপদ।

কিন্তু উপায় ?

অফিসে রোজ টিফিনের সময় জটলা বসে। প্যাকেট প্যাকেট সিগারেট, বাণ্ডিল বাণ্ডিল বিড়ি পুড়ে ছাই হয় কিন্তু কোন সুরাহাই হয় না।

অনেক ভেবে চিন্তে গোলোক বাবু বললেন—এক কাজ কর, বৌকে এক্সেসাইজ করাও। মানে ডন, বৈঠক, ডাম্বেল মুগুর ভাঁজা শেখাও।

সবাই সায় দিলে, কথাটা খুবই যুক্তিপূর্ণ।

বংশীবদন বৌকে ডাম্বেল আর মুগুর কিনে দিলে। কিন্তু মাস খানেক যেতে না যেতেই বংশীবদন মুখ কাঁচুমাচু করে এসে দাঁড়ালে—না দাদা, সুবিধে হল না!

—কেন ?

—ডাম্বেল আর মুগুর ভাঁজার ফলে বৌয়ের প্রচণ্ড খিদে বেড়ে গেছে। ফলে বৌয়ের আয়তন আরো দেড়গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সবাই আৎকে উঠলো—বল কি হে ?

সবে চাকরীতে ঢোকা কমবয়েসী ছোকরা নিশিকান্ত বললে—বংশীদা, বৌদিকে রোজ স্কিপিং করান না কেন ? দেখবেন সব ফ্যাট্ ঝরে যাবে। স্কিপিং করার জন্যেই আমেরিকায় ইয়ং গার্লদের ভাইট্যাল্ স্টাটিসটিক্স হল ছত্তিরিশ, পঁচিশ, ছত্তিরিশ।

স্টাটিসটিক্স শুনে সবাই থ বনে গেল। অকাট্য যুক্তি, খুবই বিজ্ঞান-সম্মত প্রস্তাব। সেই দিনই বংশীবদন ফেরার সময় স্কিপিং

রোপ্ কিনে নিয়ে ফিরলো।

কিন্তু দুদিন যেতে না যেতেই আবার মুখ শুকনো করে ফিরে এল।

—কি হল হে ?

—আর বোলো না দাদা, ঐ স্কিপিং করার জন্যেই বাড়িওলা ক্ষতিপূরণ দাবী করে বাড়ি ছাড়ার নোটিশ দিয়েছে।

—কেন, ...কেন ?

—কারণ ঐ স্কিপিং করার জন্যেই ছাতের টালি খসে পড়েছে।

—সর্বনাশ ! তা হলে উপায় ?

সবাই হতাশ হয়ে পড়লো। গঙ্গাধর বাবু বললেন,

—এক কাজ ক'র। বৌকে নাচ শেখাও।

—তার মানে...বল্ ডান্স ?

—আরে না না। কথাকলি, মণিপুরী কিম্বা ভরত-নাট্যম। আর তোমাদের আপত্তি না থাকলে, টুইস্ট।

—ঠিক আছে। টুইস্ট শিখলে যদি বৌ রোগা হয়, দিন-রাত টুইস্ট শিখলেও আপত্তি নেই।

বংশীবদন বৌকে একটা নাচের স্কুলে ভর্তি করে দিলে। তারপরেও দেখা গেল, বংশীবদন মুখ গোমরা করে বসে আছে। আবার সবাই ছেঁকে ধরলে।

বংশীবদন আমতা আমতা করে জানালে, অজকাল নাচের মাষ্টার রোজ বৌকে বাড়ী পেঁাছে দিতে আরম্ভ করেছে। বৌও মাষ্টারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

এ আর এক ফ্যাসাদ। বেশ বোঝা গেল বংশীবদন যদিও বা বৌ-এর মোটা হওয়া সহ্য করতে পারে, কিন্তু মাষ্টারের পেঁাছে দেওয়ার মত পরোপকার ও সহ্য করতে পারে না।

দাশরথি বাবু পরামর্শ দিলেন—তুমিই বরং অফিস ফেরৎ বৌকে সঙ্গে করে নিয়ে এস।

বংশীবদন মুখ গোমরা করে রইলো।

—বুঝিছি, বৌ-এর সঙ্গে হেঁটে আসতে লজ্জা করে। অল-রাইট্, রিক্সায় করে এস।

দুদিন বাদে বংশীবদন আবার মুখ চুণ করে এসে দাঁড়ালো।

—কি ব্যাপার ?

—না দাদা, রিক্সায় সম্ভব নয়। একটা রিক্সায় পাশাপাশি দুজন ধরে না, তাই আমাকে পা-দানিতে বসতে হয়। তাতে পাড়ার ছেলে-বুড়ো সবাই ঠাট্টা করে। অনেকে আবার ফ্লাশ দিয়ে ছবিও তোলে।

অফিসে নরোত্তম বাবু একজন মাতব্বর গোছের লোক। তিনি বললেন—এক কাজ কর, বৌকে অম্বলের রোগ ধরাও। দুদিনে রোগা হয়ে যাবে।

সকলে মুখ চাওয়া-চায়ি করলে। ব্যাপারটা শুনতে খারাপ বটে, কিন্তু আসলে ফল ভাল।

তারপর থেকে বংশীবদন রোজ অফিস ফেরার সময়ে তেলে-ভাজা, আলুরদম, ঘুঘনি, ফুচকা কিনে আনতে লাগলো।

বৌও মহা খুশি। কিন্তু হলে কি হবে ? সব তেলেভাজা, আলুরদম, ফুচকা বৌ বেমালুম হজম করে ফেলতে লাগলো। এদিকে খরচাও প্রচণ্ড বেড়েছে।

বংশীবদন চাকরীর পর টিউশনি ঠিক করলে। টিফিনে জটলা বসলো। বংশীবদনের ঐ তো ডিগডিগে চেহারা !

তারিনী বাবু একটু ফিচেল লোক। সুবিধে পেলে একটু আধটু রাজনীতিও করেন, তিনি একটু মুচকি হেসে বললেন—ভায়া, সবাই ফেল হয়ে গেল। এবার আমার পরামর্শ শোনো। ভূতের ভয় দেখাও। ভয়ে দুদিনে শরীর আধখানা হয়ে যাবে।

অফিস সুদ্ধ সবাই একবাক্যে স্বীকার করলে, পরামর্শটা খুবই সাইকোলজিক্যাল্।

সকলে উঠে পড়ে লাগলো। বহু কষ্টে একটা মড়ার মাথার খুলি যোগাড় করে তাতে সিঁদুর মাখিয়ে বংশীবদনের বাড়ীর বাথরুমের তাকে রেখে দেওয়া হল। যাতে রাত্রে বাথরুমে গেলেই হঠাৎ নজরে পড়ে।

অফিসে সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে। যাক, এবার তা হলে একটা কিনারা হল।

কিন্তু ঠিক তার পরের দিন থেকেই বংশীবদনের অফিসে আসা বন্ধ।

একদিন, দুদিন, তিনদিন চারদিন বংশীবদনের কোন পাত্তাই নেই।

সকলেই অবাক!

অফিসসুদ্ধ সবাই দল বেঁধে বংশীবদনের বাড়ী ছুটে এল।

সবাই এসে দেখে, বংশীবদন বুকে, পিঠে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে মুমূর্ষু অবস্থায় বিছানায় পড়ে পড়ে কাতরাচ্ছে।

—কি ব্যাপার হে?

অনেক কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে বংশীবদন বললে,

—আর বল না দাদা···ভূতের ভয় গিন্নী ঠিকই পেয়েছিল। ভয়ে আঁতকে উঠে···অবলা নারী যা করে থাকে, তাই করে বসলো। ভয়ে আঁৎকে উঠে বাবাগো···মাগো···বলে ছুটে এসে মশারীর ওপর থেকেই সবেগে আমার ওপরে আছড়ে পড়লো।··· শুধু মনে পড়ে···জ্ঞান থাকতে থাকতে আমার বুকের মধ্যে মড়্ ···মড়্···মড়াৎ করে একটা শব্দ···

ব্যাস্···সঙ্গে সঙ্গে চোখে সর্ষে ফুল···।

জ্ঞান ফেরার পরেই অসহ্য যন্ত্রণা। জানা গেল তিনখানা পাঁজরের হাড় আর আস্ত নেই···।

পতি দিয়ে নাম মানিক শেঠ

যেমন মা-লক্ষ্মীরর অপার করুণায় ষষ্ঠীচরণ শর্মা রাজনৈতিক ডামাডোলে আর গেঁড়াতন্ত্রের গেঁড়াকলে প্রচুর মালকড়ি কামিয়ে বাড়ী-গাড়ী ও বিষয়-সম্পত্তি করেছেন, আবার তেমন মা-ষষ্ঠীর অশেষ কৃপায় তিনি হাফ্ ডজনেরও অধিক সন্তানের পিতা হয়েছেন অর্থাৎ পরপর সাত-সাতটা অকালকুষ্মাণ্ড থুড়ি সাতটা সোনার চাঁদ পুত্র-সন্তান জন্ম দিয়ে আসছে ও আহ্লাদে একেবারে আটখানা হয়েছেন। মা-লক্ষ্মী আর মা-ষষ্ঠী উভয়েরই কৃপাধন্য ভাগ্যবান ষষ্ঠীচরণ একসঙ্গে ধনে-পুত্রে লক্ষ্মী লাভ করে ধন্য ও মান্য-গণ্য হয়েছেন। সেজন্য আতিশয্যে ও আদিখ্যেতায় আর বেশ ঘটা-পটা করে এবং খুব মিলিয়ে মিলিয়ে তাঁর স্নেহের সন্তান-দের নাম রেখেছেন যথাক্রমে ···ধনপতি, গণপতি, সুরপতি, পশুপতি ও বিশ্বপতি ইত্যাদি কিন্তু তাঁর নবজাত সপ্তম সন্তানের নামটা পতিযুক্ত একটা উপযুক্ত কি-নাম রাখবেন তা-ঠিক ভেবে পাচ্ছিলেন না। অর্থাৎ তাঁর কনিষ্ঠ এবং পরমস্নেহের সপ্তম শ্রীমানের বেশ একটা মনের মত নাম কিছুতেই মনে আসছিল না তাই বাড়ীতে চায়ের মজলিসে তাঁর বড় কুটুম্ব-সহ স-পরিবারে চা খেতে এই নাম বিভ্রাটের কথা বলছিলেন।

ওহে ছি-পতি (শ্রীপতি) এখন ছোট খোকার নামটা—কি—পতি রাখা যায় বল দিকি?

বড়কুটুম্ব মানে পেয়ারের শালাবাবুকে জিগ্যেস করলেন ষষ্ঠী-চরণ।

বেরসিক শালাবাবুকে নিরব ও নিরুত্তর দেখে ষষ্টীচরণ একটু নিরাশ হ'ল কিন্তু এইসব ব্যাপার-স্যাপার দেখে-শুনে তাঁর প্রিয় পেলারাম গড়গড়ি খুব উৎসুক হ'ল, তাই মানিবের মুস্কিল আসানের জন্যে সে খুব উস্‌খুস্ করছিল এবং কি যেন বলার

জন্যে মনিবের কাছে ঘুরঘুর করছিল।

কিরে প্যালা কিছু বলবি ?

প্যালারামকে জিগ্যেস করলেন ষষ্ঠীচরণ।

আজ্ঞে বাউ (বাবু) আপনার ছোট খোঁকার জন্যে ভারি সোন্দর একটা নাম হটাশ (হঠাৎ) আমার মাথায় এয়েছে, আপনি যদি বলেন তো···তাহলে চটাশ করে বলতে পারি।

বেশতো তোর উর্বর মস্তিষ্কে যখন হটাশ একটা সোন্দর নাম এয়েছে···তখন পটাশ ক'রে (চট্‌পট্‌) বলেই ফেল্‌।

সাগ্রহে সম্মতি জানালেন সহৃদয় ষষ্টীচরণ।

অমায়িক মনিবের সম্মতি আর অনুমতি দু-ই পেয়ে যেন কৃতার্থ পেলারাম খুশিতে একেবারে ডগমগ হ'ল এবং মুহূর্তে এক ঝলক ঝাড়ি কষে সবাইকে একপ্রস্থ দেখে নিল। তারপর সে আনন্দে ও উচ্ছাসে এবং ফিক্‌ ক'রে হেসে ও ফস্‌ করে বলেই ফেললো আজ্ঞে বাউ (বাবু), আপনার এতোগুলো পতির পর এবার আহ্লাদ করে আপনার ছোট খোকার খাসা নাম রাখুন—ভগ্নিপতি!

প্রাপ্তিস্বীকার ঃ

সাহিত্য মান্দাস। নিরিখ। একজোট। মোহনা। সঙ্খসাথী। সবুজ আঙ্গিনা। একক। সমাজ দর্পণ। মৃগবেড়িয়া। মুরারিপুকুর। সেই সন্দীপন। সাহিত্যবাণী। প্রকৃত নমিতা। বন্দেমাতরম্‌। আহ্বান। অর্ক। দেবাঞ্জলি। প্রিয়শিল্প। সাহিত্য কহন। প্রগতি। সাহিত্য সেতু। দিব্যজ্যোতির পথে। আসুক বসন্ত ফোটাক ফুল। সোনালী রুপোলী। শব্দযাপন। অনুকৃতি। যাজ্ঞসেনী।

আনন্দ-বেদনা নীরেন্দ্র গুপ্ত

আনন্দ সে উচ্ছ্বসিত জলের প্লাবন
সব কিছু মুছে দিয়ে যায়।
বেদনা সে চিরন্তন যেন শিলালিপি
সব কিছু এঁকে রাখে অক্ষয় রেখায়॥

তবে হঠাৎ ধরিত্রী চক্রবর্তী

একটি প্রবাল দ্বীপ পার হয়ে যদি
নক্ষত্রের অভিসারে যেতে চাও,
সে তোমাকে ছাড়িয়ে আরও উর্দ্ধে উঠে যাবে,
তুমি তাকে পাবে না।

একটি ছায়া ঘেরা কুঞ্জ হতে উড়ে গিয়ে
যদি যেতে চাও
যেথা আছে দারুচিনি এলাচের বন,
তুমি খুঁজে পাবে না।

একটি উষর মরু পার হতে হতে
যদি বিস্তীর্ণ প্রান্তরের তাপে দগ্ধ হয়ে যাও,
বেদনার অশ্রু বিন্দু রৌদ্রতপ্ত হয়ে,
যদি হয়ে যায় অজস্র বালুকণা,

তবেই হঠাৎ,
দিগন্তে দেখা দেবে সজল কালো মেঘ,
আর, পৌঁছে দেবে তোমাকে সেই ঠিকানায়,
যেখানে যেতে চেয়ে, রয়েছ দাঁড়িয়ে তুমি
বেদনার্ত অপেক্ষায়, আজীবন।

প্রতিকৃতি রণজিত মিত্র

এখনো উতলা তুমি নন্দিনীর ডাকে
রঞ্জনের মৃতদেহ ঘিরে—
উহার বাহিরে তুমি এখনো কি চলে আসো
জনতার মাঝে—
হীরে খনিতে হত শ্রমিকের রক্ত নিয়ে
রক্ত করবীর রঙ আরো গাঢ় উজ্জ্বল হয়।

দৃশ্য বদলে দেখি গ্যালিলিওর করুণ মিনতি
নিষ্ঠীবনে ভরে যায় রঙ্গমঞ্চ এধার-ওধার
ওয়াদিপাউস্ এখনো শোকার্ত্ত তুমি
পাপের প্রায়শ্চিত্ত মনে রেখে
এখনো কি তিলে তিলে খুন হও তুমি!

রাজার চিঠির খোঁজ এখনো অমল করে
ডাকঘর হতে
'রাজা আসছেন, মনের জানালা খুলে দাও'
ঠাকুর্দা খবর দেন অমলের কাছে।

মানিকের জীবন ঘিরে তুমি অভিশাপ
মরণের পরে তুমি আজো বেশী আলোচিত
শিল্প কর্ম ঘিরে।
চার অধ্যায় নিয়ে তোমার জীবন শুরু
বহুরূপে বহুরূপী মাঝে
পুতুল খেলায় যারা জীবন গড়ে গর্ভধারিণী
পরিণামে দশচক্র বোঝা

মধু বংশীর গলি থেকে কেউ আজ হেঁকে যায়
রাজা নেই, রাজা নেই, রাজা নেই রাজা
চাঁদ বণিকের পালায় রাজা এখন সমুদ্রাভিযানে।

মনের দিগন্ত ওমর আলী

ওইতো আকাশ নেমে মাটি নদী নালা গাছ সমুদ্র
পাহাড়ের হৃদয় ছুঁয়েছে
মাত্র এক দুই কিলোমিটার দূরে ওইযে বিবাহ কিংবা বিচ্ছেদ
ধোঁয়াটে সংসার ঝগড়া লোকালয়
জন্ম মৃত্যু মান অভিমান প্রেম বিরহ মিলন ওইতো দিগন্তে
হাসি কান্না সুখ দুঃখ
যতোই এগোই ততোই মনে হয় ওই একই দূরত্বে
কাছে যেতে থাকি দিগন্ত ও ভীরু সন্দিগ্ধ সরে যেতে থাকে
আমি থামি দিগন্ত ও একই দূরত্বে থামে চিন্তান্বিত
সবুজের মধ্যে শুভ্র নক্ষত্র
তোমার মনও দিগন্তের মতো খুব কাছে মনে হয়
কিন্তু না আমি এগোলেই তোমার মনও নিরাপদ দূরত্ব বজায়
রেখে সরে যায়
অর্থাৎ তোমার মন যতো কাছে আছে মনে করি
ততো কাছে নেই কিংবা থাকেনা
গাছপালার ওপরে চাঁদ ভেতরে নক্ষত্র যেন জোনাকি
যতো কাছে যেতে থাকি ততো আরো ভীরু রমণীর মতো
সরে যেতে থাকে
তোমার মনের দিগন্ত কিছুতেই ছুঁতে পারিনা
সেই কবে থেকে তোমার মনের দিগন্তে পৌঁছাতে
চেষ্টা করছি নীড়ে ফেরা পাখি

কিন্তু আজো পেঁছাতে পারিনি
তোমার চতুর মরীচিকা শুধু আমাকে টেনেছে
আমার তাপিত মরু তৃষ্ণা আজো মেটায়নি
রহস্য কি কুহেলিকা তোমার মনের
আজ পর্যন্তও জটিল দুর্বোধ্য শব্দ বাক্য
অথচ তোমার মনের দিগন্তের খাঁ খাঁ প্রান্তরের শূন্যতায়
কতো সহজ জলের হাতছানি খুব কাছে
খুব কাছে গোল্লা ছুটের এক দৌড়েই পেঁছানো যাবে
কিন্তু যায়না পেঁছানো তোমাকে ছোঁয়ার জন্যে আমি এগোলেই
হিসাবের অসাধ্য কিলোমিটার দূরে
ক্রমাগত সরে যেতে থাকে তোমার রহস্যময় মনের দিগন্ত...

ভাবনা রুণা মণ্ডল

নিঃসঙ্গতা অথবা একাকীত্ব
কথাগুলো আপেক্ষিক ;
অথবা তুলনামূলক।
দুটি মানুষের নিঃসঙ্গতা
বা একাকীত্ব
একত্রিত হলে তা পারস্পরিক ;
আমি অনুভব করেছি ॥

শরৎ আলোর কমলবনে আরাধনা গুপ্ত

এক গুচ্ছ কাশ হাতে নিয়ে
খালের ধারে বসে আছি—
তুমি মা আসছ এটাই বুঝছি—
শিউলিগুলির খুব মন খারাপ

তাদের যাবার বার্তা বাতাসে ও ঘাসে—
এমনই দিন বদলাচ্ছে—
চারদিকে শুধু নেই শোনা যায়
এর মধ্যে তুমি এসে পাবে কত কষ্ট
তবু কচি ধানের সবুজ ক্ষেতে
বাতাস বয়ে চলেছে
মনগুলি যে কোথাও উধাও হয়ে যায়।
তুমি এস অতি সাধারণ ভাবেই
অন্তরের গভীরতা এনে
সাজাব পুজার থালা—
কমল বনে তুমি এসে হেসে ওঠো
প্রস্ফুটিত পদ্ম হাতে নিয়ে
তোমায় প্রণাম করি।

তখনও বাজীরাও সেন

তুমি আর ভাস্কর্যের ব্রীড়াময়ী নও,
ভেঙে চুরে ললিত শরীর শিল্পিত শব্দেরা গেছে,
ছন্দের মিনার থেকে জীবিকার বন্ধুর প্রান্তরে।
তুমি তাই অলংকার মিলিত মেখলা, খুলে ফ্যালো,
গদ্যের মাটিতে আঁকো কবোষ্ণ শরীরে—
কংকরের অজস্র আঘাত, নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে মাখো
বারুদেরও ঘ্রাণ।
যখন বাতাস ছেঁড়া ঈগলের ধারালো নখরে,
বাহুর পল্লবে আর আলিঙ্গন নেই।
তুমিও বহুধা, বিষণ্ণ, ধূমল।
অথচ তখনও দিন শেষ হলে
ঘাসে ভেজা নিপিষ্ট শরীর মেলে ধরি,

তারা জ্বলা আকাশের নীচে
মেঘদেরও ভাঁজে ভাঁজে নিরন্তরই খুঁজি—
অন্য কোন রং কিম্বা অন্য কোন চটুল সুরভি।
নিষ্করুণ তোমার প্রতিমা থেকে
তখনও কবিতা খুঁজি,
ছন্দশীলা! খুঁজে ফিরি জীবনের সর্বশেষ মিল।

আহ্বান সুধা চট্টোপাধ্যায়

মনে মনে গড় মন্দির মসজিদ,
গির্জ্জা বৌদ্ধস্তূপ
কলকোলাহল থেমে যাক সব
হয়ে যাক নিশ্চুপ,
প্রাণের দেবতা বসুন এবার
হৃদয় সিংহাসনে,
মানবতা হোক ধর্ম্ম সবার
উপাসনা মনে মনে,
নব জাগরণ আসুক জীবনে
প্রেম অমৃত বিকশি
হিংসা দ্বেষ ও লোভ ও অহংয়ে
নিঃশেষে তারে বিনাশি,
বিধাতা তোমার শক্তিরে কর
বিকিরণ জনমাঝে
যেন তারা রোধে যত অন্যায়
এ জগতে যাহা আছে
নবীন রবির স্বর্ণ কিরণে
জাগুক পুনঃ এ ধরণী

কাণ্ডারী তুমি বেয়ে লয়ে চল,
নব যুগে তব তরণী।

কবির আবেদন।। বাবরী মসজিদ নিয়ে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে সেটি সমাধান কল্পে এই নিয়মটি করলে আশা করি ভালই হবে। ঐ স্থানে একটি সুদৃশ্য সভাগৃহ নির্মাণ করা হোক, মনোরম পুষ্প উদ্যানের মধ্যে। সকল ধর্ম সম্প্রদায় সেই সভা গৃহে প্রার্থনা করতে পারবেন, পৃথক পৃথক। নির্দিষ্ট দিনে। তাহলেই মনে হয় এই জটিল সমস্যার সমাধান হতে পারে।

দুটি কবিতা তন্দ্রা বন্দ্যোপাধ্যায়

কেন ?

মেঘেরা করে কেন এত ছুটোছুটি,
একে অপরের গায়ে ভীষণ লুটোপুটি।
দুষ্ট ছেলেদের মত চপলতা হুটোপুটি,
সদাই কি আনন্দে হেসে কুটোকুটি।
তারা তো করেনা হাঁটাহাঁটি,
ভেসে ভেসে চলে সাঁতার কাটি।
আমরা তো হতে পারি মেঘের মত,
পাড়ি দেব আকাশ শত শত।।

এপিসোড

জীবনটা যে শত এপিসোডের গল্প
চলছে যেন কত আদি কাল কল্প।
আছে প্রভূত দুঃখ, সুখ-ভাগ খুবই স্বল্প,
জীবন এত লম্বা না হয়ে হতে পারত অল্প।

ক্ষুদ্র তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর মোরা যত নগন্য,
আখরি এপিসোড কবে হবে হে মহামান্য।
ডিরেক্টর সাহেব এসব কথা আপনার জন্য,
অভিযোগ শুনে ব্যবস্থা করে করুণ ধন্য।

ওই দুটি চোখ শান্তিময় বন্দ্যোপাধ্যায়

[জনৈকাকে মনে রেখে]

ওগো সুচরিতা,
তোমার চোখদুটি শুধুই নয় যে প্রাণবন্ত
ওই দুটি চোখে আছে আরো অনেক অব্যক্ত ভাষা
আছে অনেক প্রশান্তি—অনেক স্নিগ্ধতা

দার্শনিক বা শিল্পীর মতো ধ্যানমগ্ন
কবির মতো স্বপ্নালু উদাসী,
প্রেমিক-প্রেমিকার মতন নিবিড় মধুর,
হরিণীর মতো কালো-আয়ত-ডাগর
শিশির-ভেজা তৃণের মতো কোমল
আর ছায়াঘেরা দীঘির মতন অতল
তোমার ওই দুটি চোখের গভীরে
আছে বিশ্বের সকল মাধুর্য—সকল রহস্য
আছে অনেক বিশ্বাস ও সরলতা
আছে অনেক স্নেহ-মমতা-ভালবাসার কাজল
যা মেখে যে কেউ অসুন্দরও হতে পারে সুন্দর
হতে পারে বাঙ্ময়-গীতিময় প্রেমময়

ফ্যেলা নামে ছেলেটা হরি ভট্ট

মনে হয় তিন কুলে কেহ নাই তার,
সবাই বলেযে তাকে, রাস্তার ছেলে,
গোত্র হীন, পরিচয় হীন,

অর্দ্ধ উলঙ্গ, শুধু পরণে কৌপিন
একমাত্র অঙ্গবেশ যার।

তবু তারে ডাকে সবে ; ফ্যেলা নাম ধরে ;
হয়তো বা কেহ তারে ফেলেছিলো—
অতি শিশুকালে, ভুমিষ্ট হওয়ার পরে।
কোনো ডাস্টবিনে, কিম্বা কোনো
জঞ্জালের সাথে, রাস্তার
ময়লা ফেলার ভ্যাটের উপরে।

সেই স্থান হতে কোনো পুত্রহীনা—
ভিখারিণী এক, হয়তোবা তুলে নিয়ে—
গিয়াছিল তারে, পুত্ররূপে মানুষ করিতে।
মনে হয় তারই দেওয়া নাম,
পাথর ফুঁদিয়া কেহ গড়েছে—
ফ্যেলারে, দেহতার সবল সুঠাম।
শুধু এইটুকু আন্দাজের,
সন্দেহ দোলায়, পরিচয় তার,
সকলের সব কাজে লাগে সে যে
ভালো মন্দ না করি বিচার।

কেহ তারে ঘৃণা করে, কেহবা করুণা,
আঁট সাঁট দেহখানি তার,
রং কালো কষ্টি পাথর,
কারো কোনো মানে নাকো মানা—
কি করে বাঁচিল সে যে, কারো নাহি জানা।
সবায়ের ফরমায়েস্ খাটে,—
যেথা সেথা যায় কোনো-খানে,
কেহ দেয় বেদম প্রহার,

কোন কিছু না করি বিচার।
কাঁদে নাকো, হাসি তায় লেগে আছে—
মুখে, সারাটি বদনে।
বহু কিছু গুনের মধ্যে, চুরি দোষ—
একদম নাহিকো তাহার—
তাতেই সন্তুষ্ট, যে যা দেয়, পয়সা, খাবার।

রোগ নাই, নাহি কিছু শোকের বালাই,
নাহি কোনো আত্মীয় বন্ধন,—
কেহ তারে দেখেনিকো, কোন অজুহাতে
কোন কিছু চাহিদার তরে করিতে ক্রন্দন।
তাড়ালেও যায়নাকো সে যে,
আবার ফিরিয়া আসে, যমের অরুচি।

তবে ব্যেটা বড় ধড়িবাজ,
পাত পেড়ে বসে যায় সে যে,
কারো বাড়ী হলে কোনো কাজ।
দিতে হবে তাতে কিছু,—
যতই তাড়াবে তারে, পুনরায়,
আসিবে সে, মাথা করি নিচু।
পেটপুরে হলে খাওয়া পরে—
কখন চলিয়া যাবে, নির্লজ্জ হাঘরে।

কাহার ওষুধ, কাহারো বাজার,—
মরিলে টানিতে হবে, কাহারোবা,
পোষা কোনো জন্তু জানোয়ার।
পায়না আদর কারো কাছে,
দুঃখ নাই, শুধু নির্বিকার,—
পাত্র সে যে অতি করুণার।

মরিলে যায়না সে যে আপদ বালাই,
কিন্তু তারে সকলের বড় প্রয়োজন,
ফোলা, ফোলা বলে উচ্চৈস্বরে,
ডাক দেয় কেহ, প্রয়োজন বড়,
আনিতে হইবে কিছু ভার,—
মুখনাড়া খায় শুধু শুধু,
তবু পরিবনা বলে না আবার।
এই হয় ফোলা, খায় শুধু ঢেলা ;
আদর করেনা কেহ, কিন্তু তবু
সারাটি বদন ভরে, হাসি তার মেলা।
বোঝাতে চাহিলে, বুঝিবেনা কিছু,
শুনিবেনা কারো উপদেশ—
একগুঁয়ে শুকরের গোঁ,
যাত্রা দেখিতে ভালবাসে, বোঝেনা কিছুই,
শুধু শোনে বাঁশরীর পোঁ।
চোখ কান বিস্ফারিত যাত্রা পরিবেশ,
শুনিতে, দেখিতে ভালো লাগে যে তাহার
সাজ, পোষাক পরা, রাজা মন্ত্রী
পাত্র, মিত্র, গানের আবেশ।
কিছুক্ষণ পরে, বিড় বিড় করে—
নিজমনে একে, এক ফাঁকে, শুয়েপড়া,
ক্লান্ত চোখে, কুকুর কুণ্ডলি লয়ে।
বার দুই হাই তোলে, তারপর—
নিষ্পন্দ নিথর ঘুমে অচেতন,
এই হোলো ফোলা আর তাহার জীবন।
কেহ নাহি তার, ব্যতিক্রম শুধু—
নিধিরাম পাগলা আছে,

সবাকার নিধু পাগলা, বদ্ধ পাগোল,
জ্ঞান কিছু নাই, শুধু বকে আবোল তাবোল।
বড় ডাক্তার বলেছিলো যারে,—
সারিবার আশা আছে, ক্ষীণ,—
কভু যদি অতি দুঃখে সে যে,—
ক্রন্দন করে কোনোদিন।
ছাড়িতে পারে যে রোগ তারে,—
কোন কিছু বেদনার, কোন হাহাকারে।

বাজারের আটচালা ঘরে,
শুয়ে থাকে নিধু,জড়ায়ে ফোলারে।
নিধু বকে আবোল তাবোল,
ফোলা হাসে হিঃ হিঃ করে,
বলে বুড়ো বদ্ধ পাগোল।
নিধু মারে আদরের মার,
বেশ জোরে হয়তো দুচার।
তবু হাসে ফোলা, দুই হাতে—
টিপে ধরে পাগলের নাক,
নিধু তাই মারে আর ক'রে আঁকপাঁক।
ঝটকা মারিয়া দূরে দেয় ঠোলা,
হিঃ হিঃ করে হেসে হেসে,
ছুটে যায়, দুষ্ট অতি ফোলা।
দিন যায়, রাত্রি নেমে আসে,
হয়তো বা খেতে পায় তারা,
শ্মশান যাত্রীদের উচ্ছিষ্ট,
ফেলে যাওয়া, মুড়কি ও চিড়া।
না হলে উপোস,
ঢক্‌ঢক্‌ জল খেয়ে শুধু।

শ্মশানের ছেঁড়া কাঁথা, গায়ে টেনে নিয়ে,
শুয়ে পড়ে। রাত্রি শেষে, প্রভাতের লাগি—
পরদিন সূর্য্যোদয়ে আলোর আশ্বাসে।
এই ভাবে চলে দোঁহাকার,
দিন, রাত্রি, মাস ও বৎসর,
তাহাদের এই বাঁধা ছকে, নাহি অবসর।
একদিন কালরোগে ধরি ফোলারে,
সর্ব্বঅঙ্গে,ভরেগেলো বসন্তের গুটি, স্নায়ুক্ষীণ,
জ্বরে ও শ্লেষ্মায় অচৈতন্য ফোলা,
নিথর, নিষ্পন্দ হয়ে, গনিতেছে মরণের দিন।
পাত্র হাতে কিজানি কি খেয়ালের বশে
নিধু নিয়ে আসে, মায়ের চরণামৃত;
কোন এক ব্রাহ্মণের দিয়ে, গ্রামের প্রান্তে—
দেবস্থান শীতলা মন্দির হতে—
সন্তানের স্নেহে সে যে মাথায় ফোলারে
শোয়া নাই, বসা নাই, শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই
যেন এক অতন্দ্র প্রহরী, আগলি রেখেছে
ফোলারে তার, মাঝে মাঝে
উদাস দৃষ্টিতে দুইহাত কপালে ঠেকায়,
কাহার উদ্দেশে ? মনে হয়,—
প্রার্থনা জানায়, চক্ষুমুদে বিড় বিড় করি।
কাছে পিঠে কেহ ঘেঁষে নাকো, যদি ছোঁয়া লাগে তাই,
সবে বলে উঁহু দূরে থাকো,—
এ রোগেতে কাছে যেতে নাই—
তাই দূর থেকে, দেখে যে সবাই।
ভয়ে আর হয়তো ঘৃণায়,
নাসিকায় বস্ত্রচেপে ধীরে সবে সরে যায়।

একদিন ভোর রাত্রে, গোঙানির মত,—
অতি বেদনায় যেন, কাঁদিতেছে কেহ অবিরত।
দূর হতে সন্তর্পণে কৌতূহলী হয়ে, সবে দেখে
ভারাক্রান্ত রাত্রি শেষ, বিষণ্ণ প্রভাতে—
কোলে নিয়ে বসে আছে নিধু ফোলার—
নিস্পন্দ, মৃতদেহটাকে, অতি স্নেহে জড়ায়ে দুহাতে
কাঁদে সে যে বাঁধভাঙ্গা, বেদনার স্বরে—
গোঙানির মত জীবনেতে সবায়ের উপকারে লেগে,
পেলনা কিছুই, শুধু স্মৃতি থাক জেগে—
সবে দেখে, পাগলামি সেরে গেছে নিধু পাগলার,
ফোলা মরে দিয়ে গেছে তারে, জন্ম পুনর্বার।

স্বাধীনতা পঞ্চাশ সুব্রত চক্রবর্তী

মহাযুদ্ধের শেষে পাঁচের দশকে
দুরবস্থ ইংরাজ নানা প্যাঁচ ছকে
দেশকে বিভাগ করে ধর্মের নামে,—
ভারত ও পাকিস্তান, ডাইনে ও বামে।
ইচ্ছামত চুক্তিপত্রে দস্তখত নিয়া
বশংবদে উচ্চপদে দিল বসাইয়া।
বিচার, শাসন বিধি রহে পূর্ববৎ,
তথাপি স্বাধীন হয়ে বাড়িল ইজ্জৎ।
নেতারা ছাড়েন বুলি, হাত নেড়ে কত,—
পুতুল নাচের দেখা দৃশ্যেরই মত।

* * *

প্রকৃত ছিলেন নেতা, নেতাজী সুভাষ,
ভারত উপনিবেশে ইংরাজ-ত্রাস।

বাড়িতে ছিলেন বন্দী, বাহিরে পাহারা,
পালিয়ে তবু, সবে শুনে ট্যারা।
আফগানিস্থান ঘুরে রাশিয়া, জার্মানি,
দূর হতে বেতারেতে শুনে তাঁর বাণী
শিহরিত দেশবাসী। পরে কতদূর
বিঘ্নপথ পাড়ি দিয়ে এল সিঙ্গাপুর।
গড়িল বাহিনী এক "আজাদ হিন্দ" নাম
ভারত স্বাধীন করা হবে তার কাম।
নেতাজীর দেশপ্রেম করেছে সঞ্চার
সবাকার মনে কিসে দেশের উদ্ধার।
ধনীরা দিয়েছে অর্থ নারী অলঙ্কার
সেই দানে গড়ে ওঠে যুদ্ধের সম্ভার।
জাতিধর্ম নির্বিশেষে আজাদী সেনা
পংক্তি ভোজনে বসে, —এ দৃশ্য অচেনা।
পাহাড়, জঙ্গল, নদী,-বর্মার রণে
লড়াই জিতিয়া চলে ইংরাজ সনে
মণিপুর রণাঙ্গনে কোহিমা জিতিয়া
"দিল্লি টলাব" ডাকে উঠিল মাতিয়া
ইংরেজ বুক ভয়ে করে ধড়ফড়,
ধান-চাল দগ্ধ করি আনে মন্বন্তর ;
লাখ লাখ লোক মরে তেতাল্লিশ সনে
বাংলায় আর্তনাদ খাদ্যের বিহনে।
মারাত্মক প্রাণঘাতী বোমা আণবিক,
হিরোসিমা লোপ পেল,—কাজ দানবিক।
এইভাবে জাপানকে করে দিয়ে শেষ
মিত্র বাহিনী টানে যুদ্ধেরই রেশ।
পরাজয় মেনে নিল সুভাষ বাহিনী

তারপর শোন সেই আজব কাহিনী
নেতাজী হারিয়ে গেল নয়নের মনি
দেশবাসী মানিবেনা এটা কোন মতে !
বিজিত আজাদ হিন্দ, তিন সেনাপতি,
শাহানাজ, সায়গল আর মহামতি
ধীলনের লালকেল্লা বিচারের শুরু
সারাদেশে কল্লোল,—ভয়ে দুরুদুরু
বক্ষে ভাবিয়া মরে শাসক ইংরাজ,
এইবার আমাদের শেষ হল রাজ।
পুলিস ও সৈন্য পরে করিয়া নির্ভর
ভারত শাসন কয়ি ওরা অতঃপর
নেতাজীর দেশপ্রেমে উঠিয়াছে জেগে,
অতএব চলো এই দেশ হতে ভেগে।
যেতেই যখন হবে, করি অভিসন্ধি
ধর্মের নামে দেশ-বিভাগের ফন্দি ;
এক রাষ্ট্র মুসলিম, নাম পাকিস্তান ;
বাকি দেশ সেকুলার, দিয়েছি বিধান।
শাসনের অধিকার দেব দুই দেশে
আমাদের স্বার্থ দেখে যারা বিনাক্লেশে।"
স্বাধীনতা পঞ্চাশের আজি এ দুর্গতি,
নেতাদের নাহি প্রেম স্বদেশের প্রতি ;
নীতিজ্ঞান নাহি যার সেই বড় নেতা,
একমাত্র লক্ষ্য তার শুধু ভোটে জেতা।
আটান্ন বয়েসে অন্যে নেয় অবসর,
নব্বই হলেও ওরা ধান্দাতে তৎপর।
ক্ষমতা ও অর্থলোভ করিয়াছে সার,

হাওলা, গাওলা কেচ্ছা, কত বলি আর।
নেতৃবৃন্দ হারায়েছে লোকের বিশ্বাস,
দ্রব্যমূল্য অগ্নিগর্ভ, —ওঠে নাভিশ্বাস।
রাজনীতি করে যারা সকলে দুর্জন,
যে বসে লঙ্কায়, সে হয় রাবণ।
সংবিধানে অধিকার সকলে সমান,
বর্ণচোরারা তবু হয়েছে মহান ;
যোগ্যতা না থাকিলেও ওরা সুরক্ষিত,
দেশ গঠনের কাজ এ ভাবে বিঘ্নিত।
হিন্দিকে করিয়াছি, রাষ্ট্রের ভাষা,
দক্ষিণের রাজ্যগুলি করিতেছে গোসা।
মাশুল সমান নীতি চালিয়েছি বেশ,
লৌহ শিল্প, বস্ত্রশিল্পে বাংলা যে শেষ।
গণতন্ত্রে নির্বাচন, ভোটে প্রহসন
বন্ধ করিতে হিরো টি- এন- সেশন।
ঘনঘোর দুর্যোগে আছে এত দিশা
পাশ্চাত্যে সমাদৃত দেশের মনীষা
আমেরিকা ইউরোপে উচ্চশিক্ষা তরে
ভারতীয় ছাত্রদল অধ্যয়ন করে,
প্রমাণ করেছে শ্রেষ্ঠ অনেকের চেয়ে,
বিজ্ঞানীরা গর্বিত ইহাদের পেয়ে ;
সুযোগ পাইলে দেশে এই ছাত্রদল
ফলাইবে নিশ্চয় সোনার ফসল।
যুগ যুগ সংযমে মেধার উন্মেষ,
ভারতকে একারণে অন্যে করে দ্বেষ।
সাময়িক অবসাদ দুঃখ দৈন্য মাঝে
আশায় বেঁধেছি বুক, শুধু মনে বাজে

ভারত মহান হবে অখণ্ড সত্ত্বায়,
শ্রেষ্ঠ আসন লবে জগৎ সভায়।
সত্য দ্রষ্টা ঋষিবর ঘোষিল ভারত
জীবন সফল কর পরহিত ব্রতে;
অপরের উপকারে নিজের মঙ্গল,
এক আত্মা ভিন্ন দেহে আছে সমুজ্জ্বল।
এ দেশে মুখর হবে বেদান্তের বাণী
পঞ্চাশ শতাব্দী ব্যাপী নিশ্চয় জানি।
বীর সন্ন্যাসীর কথা হবে না যে মিছে,
দীর্ঘ নিদ্রার পর ভারত জাগিছে।

নতুন শতাব্দী অভিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়

আবাহন করি তোমায় উর্ধে বাহু তুলে
হে নতুন শতাব্দী জরা গ্লানি সব ভুলে
কি সৌভাগ্য মোদের আজো বেঁচে আছি যারা
দেখেছি শতাব্দ শেষের সূর্য্য চন্দ্র তারা।
প্রভাতে আসে নাই শীত, শুধু উত্তপ্ত সমীরণ
উত্তর হতে বয়ে চলে আসে, চঞ্চল কিযে মন
সহসা ভাবিনু বুঝি এলো ঘোর তমানিশা
মানুষ কত আর ফিরিয়া পাবে না দিশা॥
যে দিশা চিহ্নিত করেছেন ভারতের বুকে
কত শত মনিষী মহর্ষি কত যুগে যুগে
কত বিজ্ঞানী কত মহান দার্শনিক কবি
মানব অন্তরে রেখেছেন চিরন্তন ছবি
নব দশকে আবার জন্ম নেবেন কি তারা?
দেখাবেন মানবেরে নতুনজীবন ধারা
ত্যাগ করি বহু পরিচিত অধমের বর্ষ

মানুষ কি চিনিবে আবার মানুষের ধর্ম?
হয়তো এসব অলীক স্বপ্ন হবে না সত্যি
অপমান অসম্মান হবে না সহজে শেষ
নিষ্ফল প্রতিবাদে মানুষ হয়ে গেছে মেষ॥

ঘুষ শৈলেন চট্টোপাধ্যায়

ঘুষ খাও ভাই-ঘুষ
অতি উপাদেয় এই ঘুষ
লঘু পাচ্য ও এই ঘুষ
ঘুষ খাও ভাই ঘুষ॥
লুকিয়ে খাও, প্রকাশ্যে খাও
কে খায় কে না খায় বুঝিবেনা কেউ
চোঁয়া ঢেঁকুর উঠিবে না
লঘুপাট্য এই ঘুষ॥
তবু বলে দিই—সাবধানে থেকো
পড়ো নাক ধরা হাতে নাতে
বদ হজমে বমি হয়ে উগরে দিতে হতে পারে তাতে
—বিব্রত হলে তেমন অঘটনে
স্মরণ করিও কোনো দুঃশাসনে
পার করে দেবে সত্বর
সহায় হবে কোন রাজ্যেশ্বর॥
দূরে রেখে সি. বি. আই. এনকোয়ারী
মাভৈঃ রবে ভাসাও তরী
হবে জয়॥
ঘুষ খাও ভাই ঘুষ॥

অন্তরালের সাধক-কবি আদিত্যকুমারের জন্মশতবর্ষ-পূর্তি

আশুতোষ মেমোরিয়াল হলে ১৬ নবেম্বর ১৯১৭ রবিবার সকাল দশটায় অন্তরালের সাধক-কবি আদিত্যকুমার গোস্বামীর (১৮৯৭—১৯৫০) জন্মশতবর্ষ-পূর্তি অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়। সভাপতিত্ব করেছেন ড. শুদ্ধসত্ত্ব বসু। সাধক-কবির চিত্রপট মঞ্চের বাঁ পাশে ছিল। দুপাশে কলাগাছ ও পতাকার আকারে রঙিন কাগজ কেটে ফিতে করে মঞ্চে সর্পিল গতিতে শোভা দিচ্ছিল।

প্রথমেই মঙ্গলাচরণ দিয়ে সভার কাজ শুরু হয়। পরে কবির চিত্রপটে মাল্যদান করেন বিনয়কৃষ্ণ গোস্বামী, লক্ষ্মীরাণী রায় ও অঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায়। অতিথি বরণের পরে 'আদিত্য-গীত-মাধুরী সঙ্গীত সম্পুট' প্রকাশিত হয় প্রধান অতিথি অমর পালের হাতে। মানপত্র পাঠের পরে সভাপতি সঙ্গীতশিল্পী অমর পালকে বস্ত্র, মাল্য, মানপত্র, থালা, পাঁচশত এক টাকা এবং গ্রন্থাদি উপহার দিয়ে সম্বর্ধনা জানান। গ্রন্থাদির মধ্যে ছিল—সহজ সরল গদ্যে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌ গীতা (নবপত্র প্রকাশন) মহাদাতা মহাপ্রভু, সাধক-কবি আদিত্যকুমার ঃ জীবনী ও রচনা, আদিত্যকুমার-স্মরণমঙ্গল এবং ছবি-ছড়ার মজার গল্প।

বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে প্রথমেই প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক দেবদাস জোয়ারদার তার ভাষণে বলেন, সাধক-কবি আদিত্যকুমার ছিলেন প্রেমিক। তিনি প্রেমের পথে ঈশ্বরকে সাধনা করেছেন। তাঁর রচিত গান শুনে মনে হয়, চণ্ডীদাস যেমন বলেছেন—সবার উপরে মানুষ সত্য তেমনি আদিত্যকুমারও ছিলেন মানব প্রেমিক। তাঁর সাধনা ছিল মনের মানুষের সন্ধান করা। তিনি অধরাকে ধরার সাধনায় ভালবাসা দিয়ে পরম সত্ত্বা আনন্দময়কে পেতে চান। এই সাধক-কবিকে শ্রদ্ধা জানাতে পেরে আমি

আনন্দিত। ঈশোপনিষদ্‌ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, গভীর অর্থে এই তর্পণ।

রাষ্ট্রভাষা মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক কুসুমাকর শাস্ত্রী হিন্দি ভাষায় ভাষণ দান করেন। তিনি বলেন,—গীতিমাধুরীর গানগুলি পড়ে আমি খুবই আনন্দলাভ করি। বৈষ্ণব ধর্ম সম্পর্কে গোস্বামীজী যে সকল গান রচনা করেছেন তা থেকে বুঝা যায়—জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি তাঁর প্রীতির ভাব ছিল।

'অর্ক' সাহিত্যপত্রের সম্পাদক সত্য বসু বলেন,—সাধক আদিত্যকুমার ভক্তিধারার কবি ছিলেন। তিনি একজন স্বাধীনতা সংগ্রামীও ছিলেন। আমি তাঁর রচিত সঙ্গীত নিয়ে কিছু ভাবনা চিন্তা করেছি। তাঁর গানে স্বদেশপ্রেম ও ভক্তির প্রকাশ রয়েছে। গানগুলো বেশ হৃদয়গ্রাহী। তিনি নোয়াখালির কথ্য ভাষায় পঞ্চাশের মন্বন্তরের এক চাষীর মনোভাব প্রকাশ করেছেন। আদিত্যকুমারের রচিত গানে দেখা যায়—আমরা যে অনেক সময় মুখোস পরে চলি তার ভিতরে আমাদের আসল রূপটি লুকিয়ে থাকে। আত্মসমালোচনার ভাবে রচিত কবির একটি গানে আছে, লোকে সাধু বলে কয় মোরে/আমার অন্তরেতে কুটিনাটি, সরল ভাব দেখাই বাহিরে।...সমাজের চিত্রও সহজ ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। যেমন—গরীবের ঘরের কথা পরকে বলে বুঝান দায়...। কবি অসাধারণ শব্দ যোজনাকরে সমাজের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরেছেন। আজকের সমাজের জন্য এটা খুবই দরকার। এই প্রসঙ্গে কবি জীবনানন্দ দাশের একটি কবিতা মনে পড়ে,—'আঁধার অতিক্রম করে যাব'। সাধক-কবির রচনায় সেই আঁধার অতিক্রম করে যাবার ইঙ্গিত রয়েছে।

সম্বর্ধনার উত্তরে প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী অমর পাল বলেন,—সাধক-কবির জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে যে সম্মান পেয়েছি তার একটা

বৈশিষ্ট্য আছে। সম্বর্ধনা এর আগেও অনেক পেয়েছি। কিন্তু আজকে এই অনুষ্ঠান অন্যরকম। সাধক-কবির এই গানগুলো এখনকার লোকদের কেমন লাগবে জানি না। আমাদের মত বয়স্কদের কাছে এগুলো খুবই মূল্যবান। উদ্যোক্তারা নীতি-গতভাবে আমাকে গান করতে অনুরোধ করবেন না বলেছেন। কিন্তু আমি নিজেই এই সুন্দর অনুষ্ঠানে একটি গান না গেয়ে থাকতে পারলাম না।সাধক-কবির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এই পূর্বাহ্নের অনুষ্ঠানে একটি প্রভাতী গান করছি। এই বলে তাঁর সেই বিখ্যাত গানখানি এই বয়স্ক কণ্ঠেও আগের মতই স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে চমৎকার গাইলেন,—'প্রভাত সমীরে শচীর আঙ্গিনা মাঝে গৌরচাঁদ নাচিয়া বেড়ায় রে'...। শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দ করতালিতে হলঘর মুখরিত হয়ে উঠল।

সভাপতি কবি শুদ্ধসত্ত্ব বসু তাঁর ভাষণে অন্তরালের সাধক-কবি আদিত্যকুমারের রচনা ও তাঁর বৈষ্ণব জীবনচর্যার উপর আলোকপাত করেন এবং অধ্যাপক জোয়ারদারের ভাষণের উল্লেখ করে তাঁর প্রশংসা করেন।

এরপর আদিত্যকুমার বিরচিত 'ছবি-ছড়ায় মজার গল্প' থেকে 'বিড়ম্বনা' কাহিনীটি পরিবেশন করেন শিখা গোস্বামী ও আরণ্যক। 'কেয়াফুল' তো তুলনাহীন। ম্যাণ্ডোলিনে রবীন্দ্র-সঙ্গীত ও নজরুলগীতির সুর বাজালো শ্রুতিরূপা গোস্বামী। কম বয়সে ভালই বাজাল মেয়েটি।

তারপর দুটি নৃত্যানুষ্ঠান হল পরপর। ব্রজের রাখাল ও রাসলীলা। ব্রজের রাখাল অংশগ্রহণ করেছেন অরিত্রা গোস্বামী, মৃদুলা চ্যাটার্জী সুপর্ণা চ্যাটার্জী, সুবর্ণা চ্যাটার্জী, সালমি দাস, বিবৃতি চ্যাটার্জী, নিবেদিতা দে, সহেলী মুখার্জী।

রাসলীলায়ঃ কৃষ্ণ—চিত্রা চ্যাটার্জী, রাধা—মিত্রা গোস্বামী, ললিতা—শ্রাবনী সিনহা, বিশাখা—অর্পিতা পণ্ডিত। এই

দুটি নৃত্য দেখে আমরা এক দিব্যলোকে চলে গিয়েছিলাম কিছুক্ষণের জন্যে। রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধাকে দেখে মনে হয়েছিল, এরা বোধ হয় কলকাতায় মেয়ে নয়। সত্যই যেন স্বর্গলোক থেকে নেমে এসেছে।

এরপর 'নারী' শীর্ষক একটি শ্রুতিনাটক পরিবেশিত হয়। রচনা ঃ প্রণয়কৃষ্ণ গোস্বামী। পরিবেশনায় ছিলেনঃ নীলা—ড. ভারতী বন্দ্যোপাধ্যায় ও শূদ্র—কবি অরূপ পান্তী—শ্রুতি-নাটকের উপর আমার বরাবরই একটু দুর্বলতা আছে। 'নারী' রচনা খুবই তথ্যভিত্তিক এবং লেখক একান্তই বাস্তবকে তুলে ধরেছেন। ভারতী বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবেশনা ভাল তবে গলা ততটা পরিস্কার নয়। অরূপ পান্তীর দৃঢ় ও নিখাদ গলায় বাচনভঙ্গী আমাকে মুগ্ধ করেছে। 'নারী' শ্রোতাদের প্রশংসা অর্জন করেছে।

শেষ অনুষ্ঠান 'নৃত্যে আদিত্য-গীতমাধুরি' সঙ্গীত সম্পুটের সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন। কণ্ঠদানে ধীরা ভট্টাচার্য, মিত্রা গোস্বামী, অঞ্জনা চ্যাটার্জী, মাল্যশ্রী গোস্বামী, রমা রায়চৌধুরী, স্বাতী পাল ঘোষ, স্বরূপ পাল, শ্রীময়ী বিশ্বাস, শ্যামল মিত্র, আলপনা গোস্বামী, আরণ্যক, অরিত্রা। সঙ্গীত পরিচালনা—স্বরূপ পাল। নৃত্যাংশেঃ চিত্রা চ্যাটার্জী, মিত্রা গোস্বামী, জয়স্তুতি মানি, মধুরিমা চৌধুরী, অণেষা মৈত্র, দেবশ্রী ঘোষ, শায়েরী দত্ত, পামেলা রায়, দেবলীনা গাঙ্গুলী, দেবরীপা গাঙ্গুলী, ইন্দ্রাণী দেব, সিঞ্চনী দাশগুপ্ত, অর্পিতা পণ্ডিত, ঈশানী চ্যাটার্জী, অরিত্রা গোস্বামী, সুস্মিতা পাল, সুদীপ্তা পাল, সুপর্ণা চ্যাটার্জী, সহেলী মুখার্জী, সুবর্ণা চ্যাটার্জী। নৃত্য পরিচালনায়—রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ইভা সিনহা ও চিত্রা চ্যাটার্জী। সহপরিচালনা—মিত্রা গোস্বামী। সাধক-কবির রচনার গুণে, সঙ্গীতমূর্ছনায়, নৃত্যের তালে, মঞ্চসজ্জার

পারিপাট্যে, আলোর বিচ্ছুরণে এক অপূর্ব দিব্য পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল।

মঞ্চ পরিকল্পনায় ছিলেন তমাল গোস্বামী। সহযোগিতায় নবীনকৃষ্ণ বিশ্বাস ও সুরত মল্লিক।

সমাপ্ত সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন আরণ্যক গোস্বামী। খালি গলায় ভাল গেয়েছিল। অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বিনয়কৃষ্ণ গোস্বামী বলেন, এই পূর্তি-অনুষ্ঠান সমস্ত অতিথিবৃন্দের সহযোগিতায় সুন্দর, সর্বাঙ্গীন, সার্থক রূপ পেয়েছে।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন কলকাতা দূরদর্শনের সুচন্দ্রা চৌধুরী। এই উপলক্ষ্যে একটি বুকস্টল দেওয়া হয় নিতাইচন্দ্র দত্তের দায়িত্বে। ঠিক দশটায় আরম্ভ হয়ে ১২টা ৪৫ মিনিটে অনুষ্ঠানের সুসমাপ্তি হয়। দর্শকশ্রোতাগণ পরিপূর্ণ আনন্দ নিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। কিঞ্চিৎ জলযোগের দ্বারা সকলকে আপ্যায়ন করা হয়।

সমগ্র অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেছেন 'সাধক-কবি আদিত্যকুমার স্মৃতি সমিতি'। শ্রীশ্রীআদিত্যকুমার গোস্বামীর চরণকমলে প্রণাম জানিয়ে শেষ করলাম।

আরেকটু উল্লেখ না করলে সম্পূর্ণতা পাবে না এই প্রতিবেদন।—কলকাতা দূরদর্শনে ২০ নবেম্বর রাত ১০টা ২০ মিনিটের খবরে বলা হয়ঃ সাধক-কবি আদিত্যকুমার জন্মশতবর্ষ-পূর্তিতে আশুতোষ মেমোরিয়াল হল-এ প্রখ্যাত লোকগীতিশিল্পী অময় পালকে সম্বর্ধিত করা হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কবি শুদ্ধসত্ত্ব বসু।

প্রতিবেদকঃ দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

Shirts A Celebration
Of Life

Woven From Finest Clothes

Excuisite Designs
For You

MAKER OF ZADE SHIRTS

A P GARMENTS

28B, Russa Road South Second Lane
Calcutta-700 033
Phone : 473 1612 4132417

Edited and published by Dhira Bhattacharya M. A. from
34/2, Mahim Haldar Str. Calcutta-700026